উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'UGC (Open and Distance Learning programmes and Online Programmes Regulations, 2020' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)

বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

কোর কোর্স : ২ (CC-BG-02)

মডিউল : ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, 2021

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)

বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

কোর কোর্স : ২ (CC-BG-02)

মডিউল : ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

পাঠ-উপকরণ কোর কোর্স ৪ CC : 2	লেখক Course Writer	সম্পাদনা Editor
মডিউল : ১ Module : 1	ড. অনামিকা দাস বাংলা বিভাগ, মানববিদ্যা অনুষদ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক দিলীপকুমার নাহা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ বারাসাত গভর্ণমেন্ট কলেজ
মডিউল : ২ Module : 2		
মডিউল : ৩ Module : 3		
মডিউল : ৪ Module : 4		

বিন্যাস ও পরিমার্জন / Formating	অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিদ্যালয় ডঃ অনামিকা দাস সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ
বাণীমঞ্জরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বেথুন কলেজ, কলিকাতা
ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা
ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা
আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা

এই পাঠ উপকরণের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)

বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

কোর কোর্স : ২ (CC-BG-02)

মডিউল : ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

মডিউল : ১ ভারতীয় আর্যভাষা ও বাংলা ভাষার উদ্ভব

একক ১	ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (ক)	৯
একক ২	ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (খ)	১৭
একক ৩	নব্য ভারতীয় আর্যভাষা	২৪
একক ৪	বাংলা ভাষার উদ্ভব	৩৫

মডিউল : ২ প্রাচীন বাংলা ভাষা

একক ৫	বাংলা ভাষার বিবর্তন	৪১
একক ৬	প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (ক)	৪৫
একক ৭	প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (খ)	৪৯

মডিউল : ৩ মধ্য ও আধুনিক বাংলা ভাষা

একক ৮	মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (ক)	৫৭
একক ৯	মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (খ)	৬৩
একক ১০,১১	আধুনিক বাংলা ভাষা	৭০

মডিউল : ৪ বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

একক ১২	বাংলা উপভাষা	৮৫
একক ১৩	বাংলা উপভাষার পরিচয় (ক)	৯৪
একক ১৪	বাংলা উপভাষার পরিচয় (খ)	৯৯
একক ১৫	বাংলা উপভাষার পরিচয় (গ)	১০৩
একক ১৬	সাধু ও চলিত ভাষা	১০৭
একক ১৭ ও ১৮	বাংলা শব্দভাণ্ডার	১১৩

মডিউল : ১

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (ক), ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (খ), নব্য ভারতীয় আর্যভাষা, বাংলা ভাষার উদ্ভব

একক ১ ❑ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (ক)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ পৃথিবীর ভাষাবংশ

১.৪ ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ও যুগবিভাগ

১.৫ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

১.৬ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

১.৭ বৈদিক ও সংস্কৃত-র তুলনা

১.৮ অনুশীলনী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করতে পারবে। পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির নাম, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব কীভাবে হল এবং সেই সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিবিধ বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।

১.২ প্রস্তাবনা

আলোচ্য পাঠক্রমে 'ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন' বিষয়ে আলোচনার জন্য মোট দুটি একক নির্ধারিত। এই প্রথম এককে আমরা মূলত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত এসেছে পৃথিবীর মোট বারোটি ভাষাবংশ, ভারতীয় আর্যভাষার কালভিত্তিক যুগবিভাজন। আলোচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের পারস্পরিক মতবিরোধের দিকগুলিও উঠে এসেছে। সারণি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীতে সেই সারণিটির উৎস চিহ্নিত করা আছে।

১.৩ পৃথিবীর ভাষাবংশ

পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষা কয়েকটি আদি উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে। সেই আদি উৎসগুলিকে বলা হয় ভাষাবংশ। ভাষাতাত্ত্বিকরা মূলত বারোটি প্রধান ভাষাবংশের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল— (১) ইন্দো-ইউরোপীয়, (২) সেমীয়-হামীয়, (৩) বান্টু, (৪) ফিন্নো-উগ্রীয় বা উরালীয়, (৫) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বা আল্‌তাইক্, (৬) ককেশীয়, (৭) দ্রাবিড়, (৮) অষ্ট্রিক, (৯) ভোট-চীনীয় বা

চীনা-তিব্বতীয়, (১০) উত্তরপূর্ব সীমান্তীয় বা প্রাচীন এশীয়, (১১) এস্‌কিমো এবং (১২) আমেরিকার আদিম জনজাতির ভাষা।

(১) ইন্দো-ইউরোপীয় : পৃথিবীর ভাষাবংশের মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবংশ। কারণ এই ভাষাবংশ থেকেই অনেক আধুনিক ভাষার জন্ম। এই বংশের আদি পীঠস্থান বিষয়ে নানা মত থাকলেও দুটি মত-ই প্রধান। কেউ বলেন, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য-ইউরোপ। অন্য মতে, দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মূল আর্যজাতি পরবর্তীকালে প্রধানত ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং মূল আর্যভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে দশটি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। সেগুলি হল— ইন্দো-ইরানীয়, বাল্টোস্লাভিক, আল্‌বানীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক, ইটালিক, জার্মানিক বা টিউটনিক, কেলটিক, তোখারীয় এবং হিত্তীয়।

(২) সেমীয়-হামীয় : এই ভাষাবংশের দুটি প্রধান শাখা—সেমীয় ও হামীয়। সেমীয় উপশাখার প্রাচীনতম নিদর্শন বাণমুখ লিপিতে-খোদাই-করা প্রত্নলেখে পাওয়া গেছে আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ২৫০০ অব্দে। এই উপশাখার দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষা হিব্রু ও আরবী। হামীয় শাখার একমাত্র ভাষা মিশরীয় এখন লুপ্ত। বর্তমানে মিশরেও আরবী ভাষা প্রচলিত।

(৩) বান্টু : মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সব ভাষাই বান্টু বংশের অন্তর্গত। যেমন, সোয়াহিলি, কাফির, জুল ইত্যাদি।

(৪) ফিন্নো-উগ্রীয় : এই ভাষাবংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফিনল্যান্ডের ভাষা ফিন্নীয় ও হাঙ্গেরীয় ভাষা হাঙ্গেরীয়।

(৫) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু : এই ভাষাবংশের মূলত তিনটি শাখা— তুর্ক-তাতার, মোঙ্গল ও মাঞ্চু। এই ভাষাবংশের প্রধান ভাষা হল তুর্ক শাখার অন্তর্গত তুরস্কের ভাষা তুর্কী ও ওস্‌মালি।

(৬) ককেশীয় : এই বংশের উল্লেখযোগ্য ভাষা হল জর্জিয়ার ভাষা জর্জীয়।

(৭) দ্রাবিড় : এই বংশের ভাষা মূলত দক্ষিণ ভারতেই প্রচলিত। মুখ্য ভাষাগুলি হল—তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কন্নড়, টুলু বা টুডু এবং ব্রাহুই।

(৮) অস্ট্রিক : এই ভাষাবংশে দুই শাখা—অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও অস্ট্রোনেশীয়। অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার প্রধান ভাষা হল শবর, সাঁওতালী, খাসী, মুণ্ডরী, নিকোবরী। এগুলি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্থানের প্রচলিত ভাষা। অস্ট্রোনেশীয় শাখার ভাষা মালয়, যবদ্বীপীয়-মালয় ও যবদ্বীপে প্রচলিত।

(৯) ভোট-চীনীয় : এই বংশের তিন শাখা : চীনীয়, থাই ও ভোট-বর্মী। চীনা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভাষা। দ্বিতীয় শাখার ভাষা শ্যামী বা সিয়ামী। তৃতীয় শাখার ভাষা তিব্বতের ভাষা তিব্বতী, ব্রহ্মদেশের ভাষা বর্মী

এবং ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত বোডো, নাগা প্রভৃতি ভাষা।

(১০) উত্তরপূর্ব সীমান্তীয় : এই বংশের প্রধান ভাষা চুক্চী এশিয়ার উত্তরপূর্ব সীমান্তে প্রচলিত।

(১১) এস্কিমো : উত্তরমেরুর সীমান্ত দেশগুলোতে গ্রীনল্যান্ড থেকে আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অবধি ভূভাগে এস্কিমো বংশের ভাষা বলা হয়।

(১২) আমেরিকার আদিম জনজাতির ভাষা : আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলি আটটি প্রধান বংশে পড়ে— আল্গোঙ্কীয়ান, আথাবাস্কান্, ইরোকোয়ীয়ান, মুস্কোজীয়ান, সিওউয়ান্, পিমান্, শোশোনীয়ান্ এবং নাহুয়াট্লান্। একমাত্র নাহুয়াট্লান্ বংশের ভাষা আট্জেক কিছুটা সমৃদ্ধিলাভ করেছিল।

১.৪ ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ও যুগবিভাগ

পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ। 'আর্য' এখানে কোনো জাতি নয়—ভাষা। ম্যাক্সমূলার বলেছেন, "Aryan, in scientific language, is utterly inapplicable to race. It means language and nothing but language..." (Max Miiller, Friedrich : 'Collected Works', New Impression, 1898, Vol. X, p. 90.)

সুতরাং, ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদিভাষা অর্থে 'আর্য' শব্দটি গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে অবশ্য 'আর্য' শব্দের অর্থবিস্তারের ফলে 'আর্য' শব্দে জাতিকেও বোঝানো হয়। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতির যে-একটি শাখা ভারত ও ইরানে চলে আসে, যাকে আমরা ইন্দো-ইরানীয় বলি, শুধু সেই শাখার লোকেরাই প্রথমে নিজেদের 'আর্য' বলে অভিহিত করতেন। পরে অর্থবিস্তার ঘটায়, সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের সব শাখার জাতিকেই 'আর্য' নামে অভিহিত করা হয়।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ বা প্রত্নলিপি পাওয়া যায়নি। তাই এই ভাষার আদিরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। এই মূল ভাষা থেকে জাত প্রাচীন ভাষা বৈদিক সংস্কৃত, আবেস্তীয়, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করে মূল ভাষার একটি অনুমান-গঠিত রূপ তৈরি করা হয়েছে।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী আর্যজাতির একটি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। একেই আমরা বলি ভারতীয় আর্যভাষা বা Indo-Aryan বা Indic Language। আনুমানিক ১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে ভারতে এই আর্যভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। আর্যরা অসংখ্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। পরে পূর্ব পাঞ্জাব, মধ্যদেশ ও উত্তরাপথের প্রাচ্য অঞ্চলে আর্যভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতে অনুপ্রবেশের কাল থেকে আজ পর্যন্ত হিসেব করলে, এই আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল প্রায় সাড়ে

তিন হাজার বছর। এই সুদীর্ঘ বছরের ভাষা-ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়—

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan = OIA)

(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA)

(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA)

ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন যুগের কালগত সীমা, যুগগত নাম ও নিদর্শন নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যায়। ডঃ রামেশ্বর শ'-এর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থ [তৃতীয় সং., ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, আনন্দ, পৃ. ৫৪৫] অনুসরণে এই সারণি প্রস্তুত হয়েছে।

যুগ	কালগত সীমা	যুগগত নাম	নিদর্শন
(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA)	আনুমানিক ১৫০০ খৃঃ পূঃ থেকে ৬০০ খৃঃ পূঃ	বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা	বেদ, মূলত ঋগ্বেদের সংহিতা অংশ (মন্ত্র)
(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (MIA)	আনুমানিক ৬০০ খৃঃ পূঃ থেকে ৯০০ খৃঃ	প্রাকৃত ভাষা, পালি ভাষা ক্ল্যাসিকাল বা লৌকিক সংস্কৃত ভাষা	অশোকের শিলালিপি, সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের সংলাপ, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্য, সাহিত্য গ্রন্থ ইত্যাদি, কালিদাস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সংস্কৃত কাব্য-নাটক ইত্যাদি।
(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (NIA)	আনুমানিক ৯০০ খৃঃ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত	বাংলা, হিন্দি, অবধী, মারাঠী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি।	আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা ও সাহিত্য।

ভারতীয় আর্যভাষার যুগবিভাগ

১.৫ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক বিস্তৃতি হল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের ভারতীয় আর্যভাষার মূল নিদর্শন পাওয়া যায় হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এ। অর্থাৎ বৈদিক ভাষাই হল ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ। বৈদিক সাহিত্য মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত—

বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক উপনিষদ। 'বেদ' বলতে বোঝায় 'ত্রয়ী' অর্থাৎ তিন যজ্ঞীয় বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ) এবং অযজ্ঞীয় অথর্ববেদ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে নানা যজ্ঞকর্মের বিবরণ এবং কিছু প্রাচীন উপাখ্যান। ব্রাহ্মণ-এরই পরিশিষ্ট হল আরণ্যক-উপনিষদ। ঋক্ ও সাম বেদ পদ্যে, অন্যান্য বেদ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত এবং ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদ প্রধানত গদ্যে লেখা।

ড. পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, বেদোত্তর বা প্রাক্-সংস্কৃত যুগের কালসীমা আনুমানিক খ্রি.পূর্ব ৮০০-৩০০ অব্দ। সাহিত্যসম্ভার ও রচনার ক্রমবিন্যাসে সেটি এইরকম—

(ক) 'ব্রাহ্মণ' জাতীয় গ্রন্থাবলী (আনুমানিক খ্রি.পূঃ ৮০০-৫০০)

(খ) বিভিন্ন আরণ্যক ও উপনিষদ (খ্রি.পূঃ ৭০০-৫০০)

(গ) 'সূত্র' জাতীয় রচনাসম্ভার (খ্রি.পূঃ ৫০০-৩০০)

এই সময়ে বেদপাঠের সহায়ক হিসেবে আরও বিশেষ শ্রেণির রচনার সৃষ্টি হয়েছিল, যা সামগ্রিকভাবে 'বেদাঙ্গ' বা 'সূত্রসাহিত্য' হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। যদিও বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রচনা সূত্রাকারে গ্রথিত নয়। বেদাঙ্গ ষড়মূলক— 'শিক্ষা' বা ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics), কল্প (Ritual), ব্যাকরণ (Grammar), নিরুক্ত (Etymology), ছন্দঃ (Metrics) এবং জ্যোতিষ (Astronomy)।

১.৬ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক :

১) ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ-সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং শ্, ষ্, স্,-সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই প্রচলিত ছিল।

২) স্বরাঘাতের স্থানপরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনির বিশেষ ক্রমানুসারে গুণগত পরিবর্তন হত। পরিবর্তনের তিনটি ক্রম— গুণ বা স্বরধ্বনির অবিকৃতি (√স্বপ্ > 'স্বপ্ন'), বৃদ্ধি বা স্বরধ্বনির দীর্ঘিকরণ (√স্বপ্ > 'স্বাপ'), এবং সম্প্রসারণ বা স্বরধ্বনি ক্ষীণ হওয়ার ফলে শব্দমধ্যস্থ ঋ, র্, ব ধ্বনির স্থানে যথাক্রমে র্, ই, উ-এর আগমন (√স্বপ্ > 'সুপ্ত'—'ব' লুপ্ত হয়ে 'উ'-এর আগমন)।

৩) সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে সন্ধিযোগ্য স্থানে প্রায় সর্বত্র সন্ধি অপরিহার্য ছিল।

৪) স্বরাঘাতের প্রচলন ছিল। বৈদিক স্বর ছিল তিন প্রকার—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত।

৫) যুক্তব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন ক্র, ক্ল, ক্ত, ক্তৃ, ক্ষ্ম, র্ম, র্দ্ধ ইত্যাদি।

(খ) রূপতাত্ত্বিক :

১) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি বচন প্রচলিত ছিল— একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। বচনভেদে ধাতুরূপ ও শব্দরূপের পার্থক্য ঘটত।

২) কারক ছিল আটটি— কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ এবং সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ।

৩) লিঙ্গ ছিল তিন প্রকার— পুং, স্ত্রী এবং ক্লীব। লিঙ্গভেদে শব্দরূপ পৃথক হলেও ক্রিয়ারূপ পৃথক হত না।

৪) শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য অনেক বেশি ছিল। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার রূপ হত পৃথক।

৫) ক্রিয়ারূপ ছিল দু'প্রকার— পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ। ধাতু তিন ভাগে বিভক্ত ছিল— পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

৬) ক্রিয়ার কাল ছিল পাঁচ প্রকার— লট্ (Present), লঙ্ (Imperfect), লৃট (Future), লিট্ (Perfect) এবং (লুঙ্ (Arrist)। লঙ্, লুঙ্ ও লিট্ ছিল অতীতকালের প্রকারভেদ।

৭) ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব ছিল— অভিপ্রায়, নির্বন্ধ, নির্দেশক, সম্ভাবক এবং অনুজ্ঞা।

৮) উপসর্গ ছিল কুড়িটি— প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ।

৯) কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ গঠনে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ছিল অদ্বিতীয়। √বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান।

১০) বৈদিক ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) তৈরি করা হত। √পা + ত্বা = পীত্বা।

(গ) অন্বয়তাত্ত্বিক :

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কর্তৃ, কর্ম প্রভৃতি কারকের এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের বিভক্তিচিহ্ন সুনির্দিষ্ট ছিল। ফলে বাক্যের মধ্যে ওই পদগুলি যেস্থানেই বসুক না কেন, তাকে সহজেই চিহ্নিত করা যেত। অর্থাৎ, বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অবস্থান পরিবর্তন করলেও বাক্যের অর্থ সেক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হত না।

১.৭ বৈদিক ও সংস্কৃতের তুলনা

প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষা ছিল মূলত বৃহত্তর জনসাধারণের মৌখিক জীবন্ত ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে অঞ্চলবিশেষে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত সাধুভাষা ছিল ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত। মৌখিক ভাষার তুলনায় তা কৃত্রিম ভাষা। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত যখন সাহিত্যের ভাষারূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। জনসাধারণের এই জীবন্ত ভাষাস্রোত থেকে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত যত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ততই তা ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধা পড়ে কৃত্রিমতর হয়ে গেছে এবং শেষপর্যন্ত তা মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে।

উভয় ভাষার পার্থক্যের মূল সূত্রগুলি হল—

১। বহু বৈদিক শব্দ ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে হয় সম্পূর্ণ লুপ্ত, নতুবা, অর্থান্তরিত।

২। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ব্যাপকভাবে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ।

৩। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে সম্ভাব্যক্ষেত্রে সন্ধি ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু বৈদিক সন্ধি এতখানি বাধ্যতামূলক ছিল না।

৪। স্বরাঘাতের পরিবর্তে শ্বাসাঘাতের আবির্ভাব ঘটে।

৫। ক্রিয়ারূপে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতের তুলনায় বৈদিক সংস্কৃতে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য অনেক বেশি ছিল।

৬। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে ক্রিয়ার ভাব সম্পর্কিত বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। পাঁচটি-র পরিবর্তে ক্রিয়ার ভাবের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনটি।

৭। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে কিছু নতুন ধাতু ও বহু শব্দ এল যা ভারতের অনার্য ভাষা থেকে গৃহীত। সেগুলো বৈদিক ভাষায় ছিল না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বৈদিক ভাষার ব্যাকরণগত বৈচিত্র্য, রূপ-প্রাচুর্য এবং পদবিন্যাস ছিল মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো বিস্তৃত এবং বিশদ। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে তা অনেক সীমিত ও সংকীর্ণ।

১.৮ অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. পৃথিবীর প্রধান ভাষাবংশের সংখ্যা আনুমানিকভাবে কত?

২. পৃথিবীর প্রধান ভাষাবংশগুলির নাম লিখুন।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে মোট ক'টি শাখার উদ্ভব ঘটে? সেগুলি কী কী?

৪. সেমীয়-হামীয় ভাষাবংশের দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষার নাম লিখুন।

৫. জর্জীয় ভাষা কোন্ ভাষাবংশের অন্তর্গত?

৬. ভোট-চীনীয় ভাষাবংশের কয়টি শাখা ও কী কী?

৭. আমেরিকার আদিম জনজাতির দুটি ভাষাবংশের নামোল্লেখ করুন।

৮. প্রাচীন, মধ্য ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষার একটি করে সাহিত্যিক নিদর্শনের উল্লেখ করুন।

৯. বৈদিক স্বর কয় প্রকার ও কী কী?

১০. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় স্বরধ্বনির দীর্ঘিকরণের একটি উদাহরণ দিন।

১১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল কয় প্রকার ছিল ও কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবংশটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করুন।

৩. 'আর্য' বলতে কী বোঝেন?

৪. ভারতীয় আর্যভাষার কালভিত্তিক বিভাজনটি সাহিত্যিক নিদর্শনসহ আলোচনা করুন।

৫. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝানো হয়?

৬. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

৮. বৈদিক সাহিত্য কয়টি স্তরে বিভক্ত ও কী কী?

৯. 'প্রাকৃত' বলতে কোন স্তরের ভারতীয় আর্যভাষাকে বোঝায়? এর বিস্তৃতিকাল উল্লেখ করুন।

১০. বেদোত্তর বা প্রাক্-সংস্কৃত যুগের কালসীমা উল্লেখ করে এই সময়ের সাহিত্য-নিদর্শনের নামোল্লেখ করুন।

রচনাধর্মী :

১. পৃথিবীর ভাষাবংশগুলি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন।

২. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩. বৈদিক ভাষা ও ধ্রুপদী সংস্কৃত—এ দুটিকে কি আপনি অভিন্ন মনে করেন? আপনার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি সাজান।

৪. পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গুরুত্বের দিকগুলি স্পষ্ট করুন।

৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আনুমানিক প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান, সময়কাল ও উপভাষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। এই ভাষাবংশের যে-শাখা থেকে ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব হয়েছে, প্রসঙ্গত তারও পরিচয় দিন।

৬. ভারতীয় আর্যভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তন, স্তরবিভাগ ও প্রাপ্ত ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

একক ২ ❑ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (খ)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা

২.৪ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাজন

২.৫ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

২.৬ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন

২.৭ অনুশীলনী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তর অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হতে পারবে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব, স্তরবিভাজন, বিবিধ বৈশিষ্ট্য, নানা সাহিত্যিক নিদর্শনের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়ে উঠবে।

২.২ প্রস্তাবনা

'ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন' বিষয়ক এই দ্বিতীয় এককটি মূলত মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আলোচনার জন্য নির্ধারিত। এই এককে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নানা স্তরবিভাজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচিত হয়েছে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক নিদর্শনকে কীভাবে চিহ্নিত করা যায়, সেটিও এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

২.৩ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা

ভারতীয় আর্যভাষা প্রাচীন পর্ব শেষে মধ্য পর্বে প্রবেশ করেছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে। খ্রিস্ট্রীয় ১১শ শতক পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। প্রায় দেড় হাজার বছর ব্যাপী ভারতীয় আর্যভাষার এই মধ্যস্তর মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বা Middle Indo-Aryan (MIA) নামে অভিহিত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগগত সাধারণ নামকরণ যদি হয়ে থাকে বৈদিক সংস্কৃত, তবে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগগত সাধারণ নামকরণ করা যেতে পারে প্রাকৃতভাষা। যদিও, প্রাচীন ভারতীয় আর্যস্তরকে শুধু 'সংস্কৃত' আখ্যা দিলে

যে-ব্যাপ্তি বা কালগত দোষ ঘটে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার পর্বকে কেবল 'প্রাকৃত' বললে সেই একই দোষ হবে। ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' বা মূল উপাদান (primeval element) অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে যার জন্ম, তা-ই হল প্রাকৃত। আসলে 'প্রাকৃত' এই অভিধাটি ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরের একটি উপস্তরের সূচক।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসের প্রাণপুরুষ যদি হন পাণিনি, তবে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা পর্বের প্রধান হোতা হলেন বুদ্ধদেব। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পুরোহিততন্ত্রশাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃতজনোচিত ভাষাই জনগণগ্রাহ্য হয়ে উঠল। অশোকের অনুশাসনে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, বহির্ভারতীয় আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থের ভাষা (খোটানী ধম্মপদ) এর স্বাক্ষরবাহী। এর পাশাপাশি ধর্মীয় বিপ্লব ও তার প্রসারের কারণে পালি (হীনযানীদের আদর্শ সাধুভাষা), বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত (মহাযানীদের আদর্শ সাধুভাষা), অর্ধমাগধী (জৈনদের আদর্শ সাধুভাষা) ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের ফলে পূর্বী উপভাষার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ধ্রুপদী সংস্কৃতের ওপরে বিশেষত শব্দাবলী ও বাক্যরীতিঘটিত প্রাকৃত প্রভাবে অশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভাষা-বিবর্তনের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল।

২.৪ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাজন

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রধানত তিনটি স্তর— প্রাচীন, মধ্য এবং অন্ত্য। প্রতিটি স্তরের আনুমানিক স্থিতিকাল নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ডঃ রামেশ্বর শ' এবং ড. সুকুমার সেন-এর মতে, প্রাচীন বা প্রথম স্তরের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিপর্ব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী। দ্বিতীয় বা মধ্য স্তরের কালব্যাপ্তি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী। আর, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত শেষ বা অন্ত্য স্তরের স্থিতিকাল।

কিন্তু ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার তিনটি-র পরিবর্তে চারটি স্তরে মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকে বিভক্ত করেছেন। তিনি প্রাচীন বা আদি এবং মধ্য উপস্তরের মাঝখানে একটি যুগকে 'ক্রান্তিপর্ব' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—

(১) আদি উপস্তর → স্থিতিকাল : খ্রি. পূর্ব ৬০০ - খ্রি. পূর্ব ২০০ অব্দ

(২) ক্রান্তিপর্ব → স্থিতিকাল : খ্রি. পূর্ব ২০০ - খ্রি. ২০০ অব্দ

(৩) মধ্য উপস্তর → স্থিতিকাল : খ্রি. ২০০ - খ্রি. ৬০০ অব্দ

(৪) অন্ত্য উপস্তর → স্থিতিকাল : খ্রি. ৬০০ - খ্রি. ১০০০ অব্দ।

২.৫ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক :

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দু'টি অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি 'ঋ' ও '৯' মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় আর থাকল না। '৯'-কার অনেক আগে বৈদিক সংস্কৃতেরই শেষদিকে লোপ পেতে শুরু করেছিল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় তা একেবারেই বিলুপ্ত হল। 'ঋ'-কার এক-এক রকম প্রাকৃতে এক-এক রকম ধ্বনিতে পরিণত হল—

ঋ > অ/ই/উ/এ (মৃগ > মগ, মিগ, মুগ)

ঋ > র/রি/রু (বৃক্ষ > ব্রচ্ছ, ব্রুচ্ছ, ঋষি > রিসি)

২) 'ঐ' এবং 'ঔ'—এই দুটি যৌগিক স্বরধ্বনি একক স্বর—যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'-তে পরিবর্তিত হল।

ঔ > ও (ঔষধানি > ওসধানি)

৩) 'অয়' এবং 'অব' সংকোচনের ফলে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। অয় > এ (পূজয়তি > পূজেতি), অব > ও (ভবতি > ভোদি)

৪) পদান্তে-স্থিত অনুস্বারের (ম্ > ং) পূর্ববর্তী এবং যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর, হ্রস্বস্বরে রূপান্তরিত হল। যেমন— কান্তাম্ > কন্তং, দীর্ঘ > দিগ্‌ঘ।

৫) পদান্তে 'অ'-কারের পরে অবস্থিত বিসর্গ (ঃ) লোপ পেয়েছে এবং সেই বিসর্গের পূর্ববর্তী 'অ'-কার কখনো ও-কারে, কখনো এ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন : জনঃ > জন > জনো/জনে। 'অ'-কার ছাড়া অন্য স্বরের পরবর্তী বিসর্গ শুধু লোপ পেয়েছে। যেমন—পুত্রাঃ > পুত্তা।

৬) পদের অন্ত্য অনুস্বার সাধারণত রক্ষিত হয়েছে। যেমন—নরম্ > নরং।

৭) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি শিস্ ধ্বনির (শ্, ষ, স্) পরিবর্তে একটি মাত্র শিস্‌ধ্বনির প্রচলন ছিল মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়—কোনো প্রাকৃতে 'শ্', কোনো প্রাকৃতে 'ষ্'।

৮) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায়, দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ ধ্বনি হলে লোপ পেয়েছে এবং সেই স্থানে পরে কখনো কখনো 'য়'-শ্রুতি বা 'ব'-শ্রুতি হয়েছে। যেমন—সকল > সঅল > সয়ল। ধ্বনিটি মহাপ্রাণ হলে তা 'হ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—মুখ > মুহ।

৯) ঋ, র্, ষ্ ধ্বনির পরবর্তী দন্ত্যধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্) পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধণ্যধ্বনির রূপ (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্) লাভ করেছে। যেমন—কৃত > কট।

১০) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে কেবল 'ক্ষ' (ক্ + ষ)-এর পরিবর্তন হয়েছে স্বতন্ত্র ধারায়। সেটি কখনো হয়েছে 'ক্খ', কখনোবা 'চ্ছ'। যেমন—বৃক্ষ > লুক্খ/রুচ্ছ।

(খ) রূপতাত্ত্বিক :

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের অন্তে স্থিত ধ্বনির পার্থক্য অনুসারে শব্দরূপ পৃথক হত। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সাধারণত 'আ'-কারান্ত, 'ই'-কারান্ত ও 'উ'-কারান্ত শব্দ ছাড়া বাকি সব শব্দের রূপ 'অ'-কারান্ত।

২) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিবচন লোপ পাওয়ার ফলে শব্দরূপে শুধু একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ রইল। দ্বিবচনের স্থানে বহুবচনের রূপ ব্যবহৃত হত। যেমন—'দ্বৌ-ময়ূরৌ'-এর স্থানে হল 'দ্বৌ মোরা'।

৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিশেষ্য ও সর্বনামের শব্দরূপ পৃথক হত। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কোথাও কোথাও বিশেষ্যের শব্দরূপ, সর্বনামের শব্দরূপের মতো হতে দেখা যায়।

৪) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বহুবচনে প্রায়ই প্রথমা ও দ্বিতীয়ার স্বরান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে পৃথক ছিল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় এই পার্থক্য প্রায়ই লুপ্ত হতে দেখা যায়।

৫) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় তৃতীয়ার বহুবচনের বিভক্তি ছিল 'ভিস্'। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মধ্যভারতীয় আর্যে এটি হল 'হি'।

৬) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ারূপে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ— দুই প্রকারভেদ ছিল। মধ্য-ভারতীয় আর্যে আত্মনেপদ লোপ পেল। প্রায় সর্বক্ষেত্রে শুধু পরস্মৈপদের ব্যবহার প্রচলিত হল।

৭) শব্দরূপের পাশাপাশি ক্রিয়ারূপেও প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দ্বিবচন, মধ্যভারতীয় আর্যে লোপ পেল। সেইস্থানে বহুবচনের রূপই ব্যবহৃত হত।

৮) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব-এর মধ্যে অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাব লোপ পেয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় তার সংখ্যা দাঁড়াল তিন— নির্দেশক, অনুজ্ঞা, সম্ভাবক।

৯) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল ছিল পাঁচটি। এর মধ্যে লঙ্, লুঙ্ ও লিট্ ছিল অতীত কালেরই প্রকারভেদ। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ওই তিন প্রকার অতীতের মধ্যে লিট্ একেবারেই লোপ পেল। আর লঙ্ ও লুঙ্ মিলে একটি রূপ লাভ করল।

১০) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় -ত্বা, -ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে বহু বিচিত্র অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ সৃষ্টি করা হত। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অসমাপিকার এত বৈচিত্র্য আর থাকল না।

১১) ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে নিষ্ঠা প্রত্যয় যোগ (-ক্ত, ক্তবতু) করে ক্রিয়ার যে-রূপ রচিত হত (√গম্ +

ত = গত), তা অতীতকালের সমাপিকা ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হত। এই রীতি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে।

(গ) অন্বয়তাত্ত্বিক :

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রত্যেক কারকের বিভক্তি সুনির্দিষ্ট ছিল। ফলে বাক্যে পদবিন্যাসের বাঁধা-ধরা নিয়মের অপরিহার্যতা ছিল না। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অনেক বিভক্তিচিহ্ন লোপ পেল। ফলে বাক্যের মধ্যে শব্দের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানের ওপরে বাক্যে তাদের ভূমিকা ও পদ-পরিচয় অনেকখানি নির্ভর করত। অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বাক্যে পদবিন্যাসক্রমের নিয়মের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।

২) কোনো কোনো বিভক্তি লোপ পাওয়ার ফলে বিভক্তির অর্থে কিছু কিছু স্বতন্ত্র শব্দ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রচলিত হল এবং অনুসর্গের প্রচলন হল।

২.৬ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের প্রধান ভাষা হল অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত। এছাড়া খ্রি. পূর্ব শতাব্দীর অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, হীনযান-পন্থী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত মিশ্র সংস্কৃত বা বৌদ্ধ সংস্কৃত এবং পালি ভাষাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম স্তরের প্রাকৃত ভাষার আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষাগুলি হল—

উত্তর-পশ্চিমা : এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম পাকিস্তানে-প্রাপ্ত অশোকের শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসনে।

দক্ষিণ-পশ্চিমা : গুজরাটের জুনাগড়ে প্রাপ্ত অশোকের গীর্ণার অনুশাসনে এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাচ্যা : এই প্রাকৃতের নিদর্শন আছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলী গ্রামে প্রাপ্ত অনুশাসনে।

প্রাচ্যা-মধ্যা : এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া গেছে মুসৌরী থেকে ষোলো মাইল দূরে অবস্থিত কাল্‌সী গ্রামে প্রাপ্ত অশোকের একটি অনুশাসনে।

অশোকের অনুশাসনের সমসাময়িক একটি লেখ নিতান্ত ক্ষুদ্র হলেও ভাষার ইতিহাসে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল **'সুতনুকা' প্রত্নলেখ**। উত্তরপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত রামগড় পাহাড়ের ওপরে যোগীমারা গুহায় খোদিত তিনছত্র প্রত্নলিপিটি প্রথম শব্দ 'শুতনুকা' থেকে সুতনুকা প্রত্নলেখ নামে চিহ্নিত হয়েছে। এই অনুশাসনের ভাষা প্রাচ্যা।

খারবেল অনুশাসন : উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পাহাড়ের হাথিগুম্ফা ছাদের তলদেশে কলিঙ্গরাজ খারবেলের অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। এর ভাষা ঠিক প্রাচ্যা নয়— কতকটা দক্ষিণ-পশ্চিমার

মতো। অশোকের গীর্ণার অনুশাসনের, বিশেষ করে পালি ভাষার সঙ্গে খারবেল অনুশাসনের ভাষার খুব মিল আছে।

পালি : দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যার সংমিশ্রণে উদ্ভুত মধ্যভারতীয় সাধু ভাষা থেকে পালি ভাষার উৎপত্তি। এটি সম্পূর্ণ ধর্মসাহিত্যের ভাষা। পালি ভাষা মূলত দক্ষিণ ভারতেই অনুশীলিত হতে থাকে। এই অঞ্চলে পালি ব্যবহারকারী হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাস করত। পরে, পালি-র চর্চা অবলুপ্ত হতে হতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ছেড়ে সিংহলে চলে যায়।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত : উত্তর ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় পালি ব্যবহার করতেন না। তাঁরা সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় গ্রন্থরচনা করতেন। এ ভাষার উৎপত্তি কথ্য সংস্কৃত ভাষা থেকে। সেই ভাষাকে এখন বলা হয় বৌদ্ধ বা মিশ্র সংস্কৃত। কুষাণ সম্রাটদের কোনো কোনো অনুশাসনে এই ভাষা দেখা যায়।

দ্বিতীয় স্তরের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শনগুলি হল—

নিয়া প্রাকৃত : চীনীয় তুর্কীস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন শান্‌শান্‌ রাজ্যের সীমান্তে 'নিয়া' নামক স্থানের বালিস্তূপ থেকে প্রাপ্ত প্রধানত খরোষ্ঠীতে এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা প্রত্নলেখগুলির ভাষা এখন নিয়া প্রাকৃত নামে পরিচিত।

সাহিত্যিক প্রাকৃত : সাহিত্যিক প্রাকৃত মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত— মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচী। সমসাময়িক কথ্য ভাষার সঙ্গে এগুলির বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্তরের নিদর্শনস্বরূপ পাই—

অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ : বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যে-লোকভাষা গড়ে উঠেছিল, পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে তাকে 'অপভ্রংশ' বলেছেন। তিনিই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তাঁর ব্যবহৃত এই শব্দটি এখন তৃতীয় স্তরের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ অভিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যভিত্তি থেকে যেমন সেই শ্রেণীর অপভ্রংশের জন্ম হল, তেমনি প্রত্যেক অপভ্রংশের পরবর্তী পরিণতি হল সেই শ্রেণীর অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট। যেমন—

শৌরশেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপভ্রংশ > শৌরসেনী অবহট্‌ঠ

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ > মহারাষ্ট্রী অবহট্‌ঠ

অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী অপভ্রংশ > অর্ধমাগধী অবহট্‌ঠ

মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > মাগধী অবহট্‌ঠ

পৈশাচী প্রাকৃত > পৈশাচী অপভ্রংশ > পৈশাচী অবহট্‌ঠ।

অপভ্রংশ হল মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তর। আর অবহট্‌ঠ হল এই তৃতীয় স্তরের শেষ ধাপ। কথ্যভাষা হিসেবে অবহট্‌ঠের স্থিতিকাল হল আনুমানিক খৃ. ৮ম থেকে ১০ম শতাব্দী। এই পর্বের শেষ দিকে বিভিন্ন শ্রেণীর অবহট্‌ঠ থেকে নানা নব্যভারতীয় আর্যভাষা যেমন— বাংলা, হিন্দি, অবধী, মারাঠী, পাঞ্জাবী ইত্যাদির জন্ম হতে থাকে।

২.৭ অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সূচনাপর্ব কোন্‌টি?

২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শিস্‌ধ্বনির সংখ্যা ক'টি?

৩. প্রাকৃত ভাষার আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষাগুলি কী কী?

৪. দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃতের সাহিত্যিক নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়?

৫. সাহিত্যিক প্রাকৃত কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল? সেগুলি কী কী?

৬. অবহট্‌ঠ—মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কোন্‌ স্তরের নিদর্শন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগবিভাজন দেখান।

২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কয়েকটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৪. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫. প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষা রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে কোথায় আলাদা?

৬. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন। প্রসঙ্গত, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তুলনায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক গঠনের পার্থক্য উল্লেখ করুন।

৭. 'সুতনুকা' প্রত্নলেখের পরিচয় দিন।

৮. টীকা লিখুন : অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ।

রচনাধর্মী :

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদে আলোচনা করুন।

২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির উল্লেখ করুন।

৩. প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

একক ৩ ❑ নব্যভারতীয় আর্যভাষা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ নব্যভারতীয় আর্যভাষা কী

৩.৪ নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ

৩.৫ নব্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

৩.৬ ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব

৩.৭ অনুশীলনী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় আর্যভাষার সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ নব্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হতে পারবে। পূর্বের দুটি এককে প্রাচীন ভারতীয় এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর এই নব্যভারতীয় আর্যভাষা, শিক্ষার্থীকে ভারতীয় আর্যভাষার সামগ্রিক ধারণা প্রদানে সাহায্য করবে।

৩.২ প্রস্তাবনা

বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয়বস্তু নব্যভারতীয় আর্যভাষা। এই আর্যভাষার উদ্ভব, বর্গীকরণের বিবিধ মাত্রা, ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব— এই এককের মূল ভরকেন্দ্র। নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গে বোধগম্যতার সুবিধার্থে এই এককে একাধিক সারণি ব্যবহৃত হয়েছে।

২.৩ নব্যভারতীয় আর্যভাষা কী?

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা হল ইন্দো-ইরানীয় শাখা। এই শাখাটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি উপশাখা ইরানে-পারস্যে এবং অন্য একটি উপশাখা ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে প্রবিষ্ট উপশাখাটিই হল ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগ পেরিয়ে ভারতে প্রচলিত আর্যভাষার বিবর্তনের তৃতীয় তথা শেষ ধাপ হল নব্যভারতীয় আর্যভাষা।

নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে বোঝায় না। আনুমানিক নবম-দশম খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল অবধি এর কালব্যাপ্তি। এই সময়কালে ভারতীয় আর্যভাষা থেকে যেসব নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে, সেগুলিই এই নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, নব্যভারতীয় আর্যভাষা হল ইতিহাসের একটি পর্বের নাম। এই পর্বের ভারতীয় আর্যভাষাগুলি হল— বাংলা, হিন্দি, মারাঠী, অবধী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ইত্যাদি।

৩.৪ নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ

ভাষাতাত্ত্বিকরা বিভিন্নভাবে নব্যভারতীয় আর্য ভাষার বর্গীকরণ বা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বিভাজনই প্রধান—

ক) অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ

খ) জন্ম-উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ

গ) ভৌগোলিক বর্গীকরণ

(ক) অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ : Friedrich Hörnle অনুমান করেছিলেন যে, আর্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। প্রথমে আগত দলটি উত্তর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। দ্বিতীয় দলটি এসে প্রথম দলের বাসভূমির কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করে এবং প্রথম দলটিকে তাদের বাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন প্রথম দলের আর্যরা দ্বিতীয় দলটিকে কেন্দ্রে রেখে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। Hörnle-এর এই অনুমানের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রথম-দলে-আগত আর্যদের ভাষা কেন্দ্রভূমির বাইরের ভাষা। অর্থাৎ, বহিরঙ্গ ভাষা বা outer language। আর, দ্বিতীয়-দলে-আগত আর্যদের ভাষা হল কেন্দ্রভূমির অভ্যন্তরের ভাষা অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভাষা বা Inner language ।

পরবর্তীকালে বহিরঙ্গ আর্যভাষা থেকে যেসব নতুন ভাষার জন্ম হয়, গ্রীয়ার্সন সেগুলিকে বহিরঙ্গ নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলেছেন এবং অন্তরঙ্গ আর্যভাষা-থেকে-জাত নতুন ভাষাগুলোর নামকরণ করেছেন অন্তরঙ্গ নব্যভারতীয় আর্যভাষা। গ্রীয়ার্সনের এই শ্রেণীবিভাগকেই বলা হয় নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ।

অন্তরঙ্গ ভাষার অন্তর্ভুক্ত হল পশ্চিমা হিন্দী ও পাঞ্জাবী। আর, বহিরঙ্গ ভাষার মধ্যে পড়ে কাশ্মীরি, সিন্ধী, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী ইত্যাদি।

যদিও, পরবর্তীকালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রীয়ার্সনের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেন। গ্রীয়ার্সনের এই অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছেও আর গ্রহণযোগ্য নয়।

সারণি-১

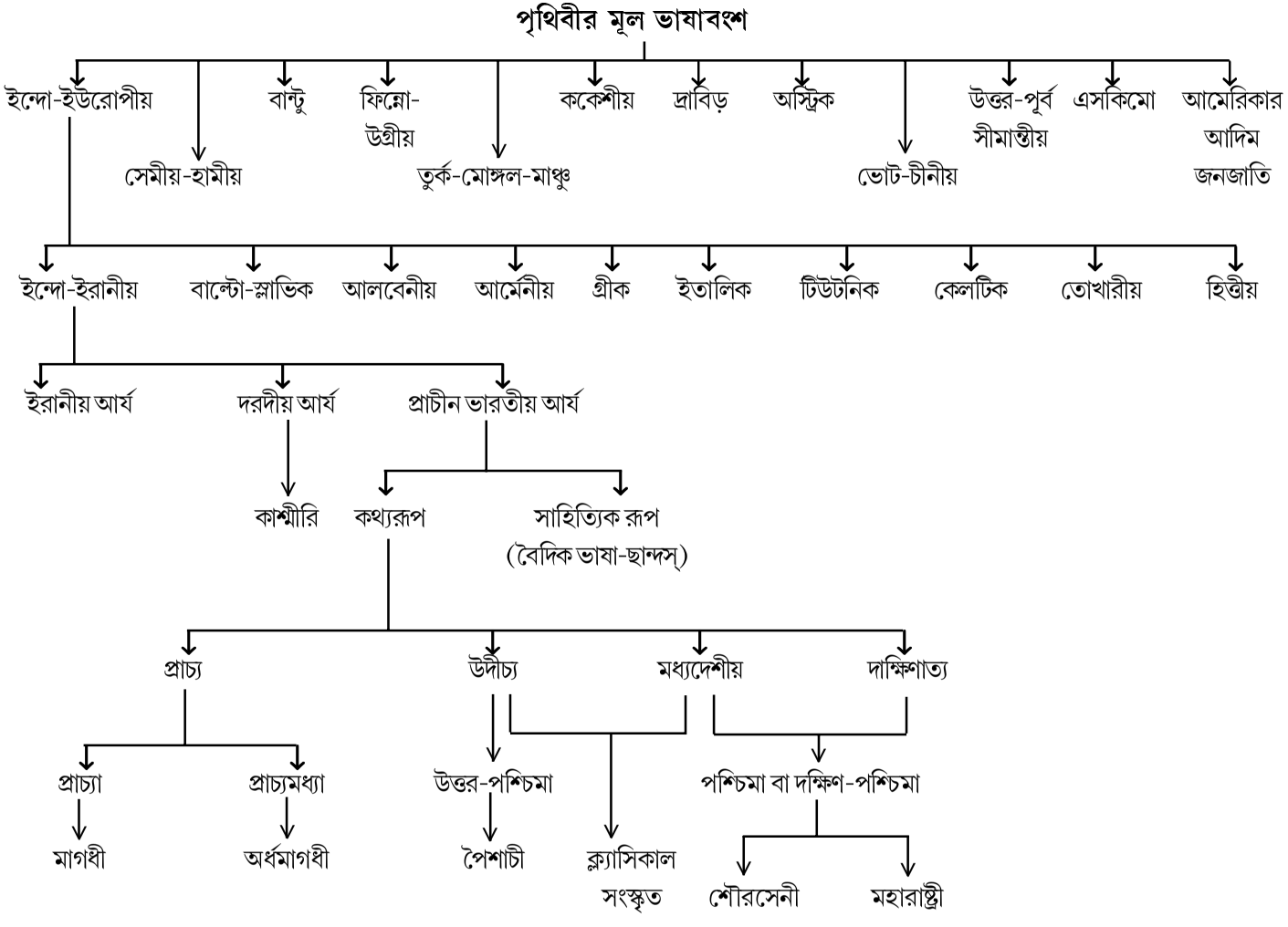
পৃথিবীর মূল ভাষাবংশ
ইন্দো-ইউরোপীয়
বান্টু
ফিন্নো-উগ্রীয়
ককেশীয়
দ্রাবিড়
অস্ট্রিক
উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয়
এসকিমো
আমেরিকার আদিম জনজাতি
সেমীয়-হামীয়
তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু
ভোট-চীনীয়
ইন্দো-ইরানীয়
বাল্টো-স্লাভিক
আলবেনীয়
আর্মেনীয়
গ্রীক
ইতালিক
টিউটনিক
কেলটিক
তোখারীয়
হিত্তীয়
ইরানীয় আর্য
দরদীয় আর্য
প্রাচীন ভারতীয় আর্য
কাশ্মীরি
কথ্যরূপ
সাহিত্যিক রূপ (বৈদিক ভাষা-ছান্দস্)
প্রাচ্য
উদীচ্য
মধ্যদেশীয়
দাক্ষিণাত্য
প্রাচ্যা
প্রাচ্যমধ্যা
উত্তর-পশ্চিমা
পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা
মাগধী
অর্ধমাগধী
পৈশাচী
ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত
শৌরসেনী
মহারাষ্ট্রী

সারণি-২

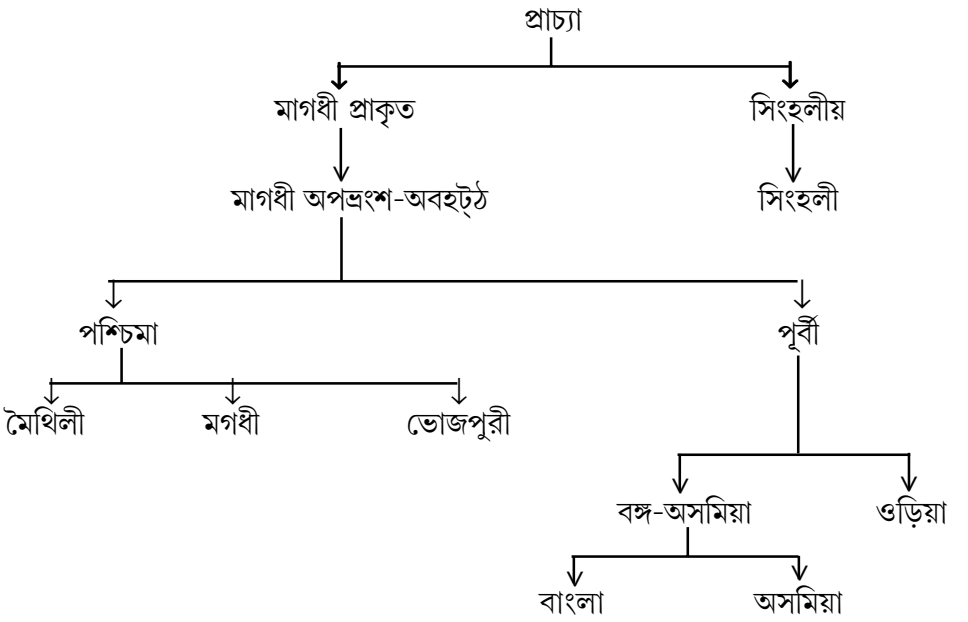
প্রাচ্যা
মাগধী প্রাকৃত
সিংহলীয়
মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ
সিংহলী
পশ্চিমা
পূর্বী
মৈথিলী
মগধী
ভোজপুরী
বঙ্গ-অসমিয়া
ওড়িয়া
বাংলা
অসমিয়া

সারণি-৩

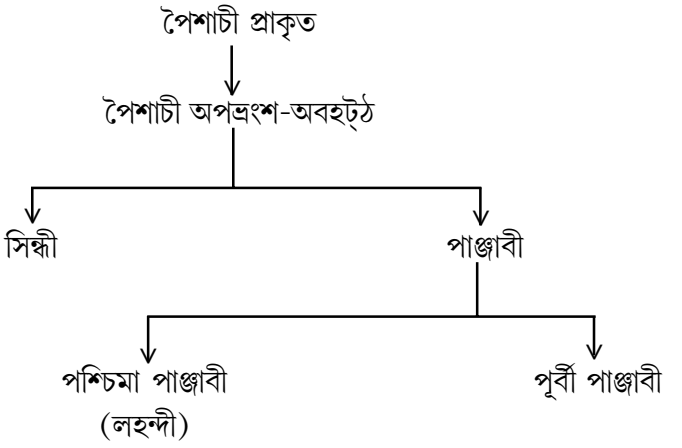
পৈশাচী প্রাকৃত
পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ
সিন্ধী
পাঞ্জাবী
পশ্চিমা পাঞ্জাবী
(লহন্দী)
পূর্বী পাঞ্জাবী

সারণি-৪

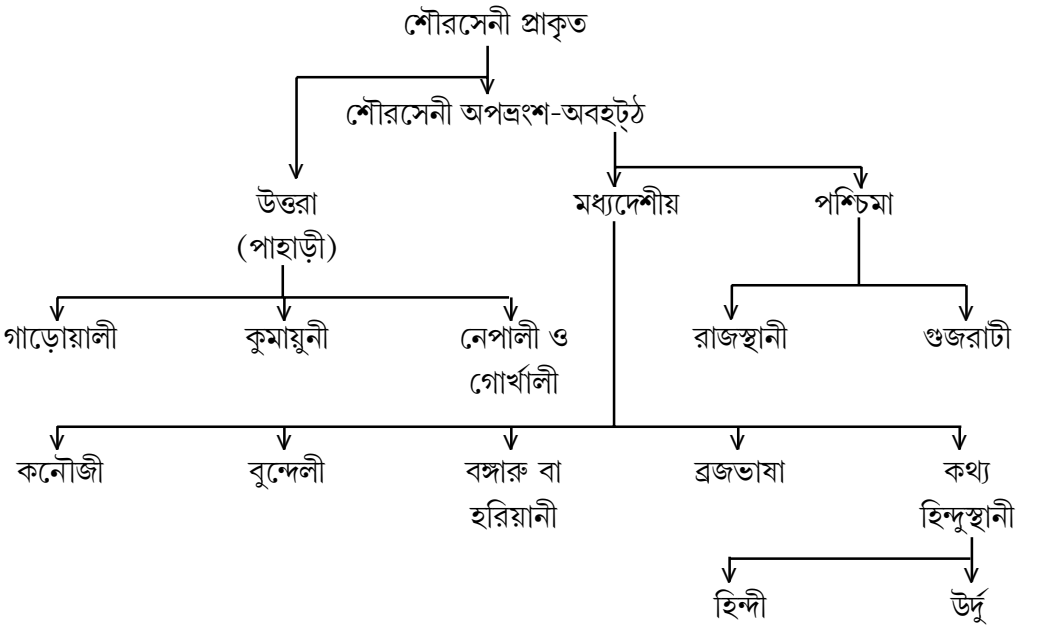

সারণি-৫

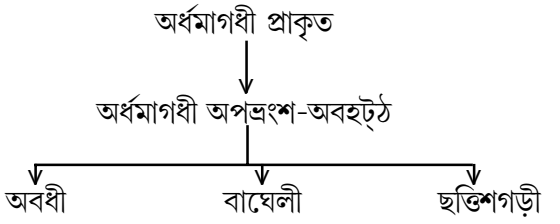

সারণি-৬

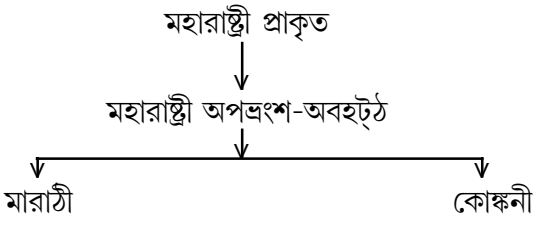

(খ) জন্ম-উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ : নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে জাত হলেও বর্তমান স্তরে পৌঁছোনোর আগে তাদের নানাবিধ বিবর্তন ঘটেছে। ছকের মাধ্যমে সেই বিবর্তনগুলি পরিস্ফুট করা হল। ড. রামেশ্বর শ'-এর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' থেকে সারণিটি গৃহীত।

(গ) ভৌগোলিক বর্গীকরণ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোর বর্তমান অবস্থান বা প্রচলন-ক্ষেত্রের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ রেখে তাদের ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ করা যায় এইভাবে—

(১) উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য) : সিন্ধী ও পাঞ্জাবী

(২) মধ্যদেশীয় : পশ্চিমা হিন্দী (অর্থাৎ কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, বুন্দেলী, বঙ্গারু ও কনৌজী), পূর্বী পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী।

(৩) প্রাচ্য : বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, মগধী, ভোজপুরী

(৪) দাক্ষিণাত্য : মারাঠী ও কোঙ্কনী।

(৫) প্রাচ্য-মধ্য : অবধী, বাঘেলী, ছত্তিশগড়ী

(৬) উত্তরা বা হিমালয়ী : গোর্খালী ও নেপালী, কুমায়ুনী, গাড়োয়ালী।

৩.৫ নব্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক :

১) মধ্যভারতীয় আর্যের যুগ্ম ব্যঞ্জন নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একটিমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হল এবং সেই ব্যঞ্জনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর পরিণত হল দীর্ঘস্বরে। যেমন—

পক্ক > পক্‌ক > পাক, দীর্ঘ > দিগ্‌ঘ > দীঘ, নৃত্য > নচ্চ > নাচ, মধ্য > মজ্‌ঝ > মাঝ,

ক্ষুদ্র > খুদ্দ > খুদ ইত্যাদি।

২) যে যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনি নাসিক্যব্যঞ্জন (ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্), সেই যুক্তব্যঞ্জনের নাসিক্য ব্যঞ্জনটি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ স্বরধ্বনি হয়ে অনুনাসিক হয়ে গেছে। যেমন— কণ্টক > (প্রাকৃত) কণ্টঅ > বাংলা কাঁটা, পঞ্চ > পাঁচ, দন্ত > দাঁত ইত্যাদি।

৩) পদমধ্যগত 'ই (ঈ) + অ (আ)' এবং 'উ (ঊ) + অ (আ)' যথাক্রমে 'ই (ঈ)' এবং 'উ (ঊ)' হয়েছে। যেমন— সং-ঘৃত > প্রা-ঘিঅ > ঘি; মৃত্তিকা > মাট্টিআ > মাটি।

৪) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় পদান্ত স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। যেমন— সংস্কৃত 'রাম' (র্ + আ + ম্ + আ) > বাংলা বা হিন্দিতে 'রাম্' (র্ + আ + ম্)। ঠিক সেভাবেই 'অগ্নি' পরিবর্তিত হয়ে হিন্দিতে 'আগ্' বা 'দধি' থেকে 'দহী' হয়েছে। অবশ্য ওড়িয়া ভাষায় পদান্তিক স্বরধ্বনি রক্ষিত হয়েছে। যেমন, ওড়িয়া ভাষায় 'রাম' উচ্চারিত হয় এভাবে—(র্ + আ + ম্ + অ)।

(খ) রূপতাত্ত্বিক :

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা হত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদান্তিক স্বরধ্বনি অনুসারে। যেমন— 'ঈ'-কারান্ত শব্দ 'নদী' হল স্ত্রী লিঙ্গ। 'আ'-কারান্ত শব্দ 'লতা' হল স্ত্রী লিঙ্গ। পদান্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি বিকৃত বা লুপ্ত হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গবিধি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় বজায় থাকেনি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গ নির্ধারিত হত অনেকক্ষেত্রে অর্থ নিরপেক্ষভাবে এবং শব্দের গঠন অনুসারে। ফলে অপ্রাণীবাচক শব্দও কখনো কখনো ক্লীবলিঙ্গ না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুং লিঙ্গ হয়েছে। যেমন, সংস্কৃতে 'লতা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু অনেক নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয় শব্দের অর্থ অনুসারে। যেমন, বাংলা ভাষায় পুরুষবোধক শব্দ পুং লিঙ্গ, স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এবং অপ্রাণীবাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। বাংলায় 'লতা' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

পাশাপাশি, কোনো কোনো নব্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গ অর্থনিরপেক্ষ হলেও সংস্কৃতের লিঙ্গ-বিধি থেকে তা স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। যেমন, সংস্কৃতে 'দধি' শব্দ ছিল ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু নব্যভারতীয় আর্যভাষা হিন্দিতে 'দধি' থেকে জাত শব্দ 'দহী' হল পুংলিঙ্গ, সিন্ধীতে 'দহী' স্ত্রীলিঙ্গ, মারাঠীতে 'দহি' ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃত 'রশ্মি' পুংলিঙ্গ, কিন্তু হিন্দি 'রশ্মি' স্ত্রীলিঙ্গ।

২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রত্যেক কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল। শব্দের সঙ্গে সেইসব বিভক্তি যুক্ত হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক কারকে শব্দের স্বতন্ত্র রূপ হত। কিন্তু নব্যভারতীয় আর্যভাষায় এই বিভক্তিগুলি প্রায় সবই লুপ্ত হল। কিছু কিছু অনুসর্গের অবক্ষয়িত রূপ বিভক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় নব্যভারতীয় আর্যভাষায়। যেমন, অনুসর্গ 'কৃত' > বাংলা 'কে', হিন্দী 'কো'-তে পরিণত হল। যেমন, বাংলায় 'রামকে', হিন্দিতে 'রামকো' ইত্যাদি।

৩) শব্দরূপের বিচারে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় কারক হল দু'টি— মুখ্যকারক বা কর্তৃকারক এবং গৌণকারক বা তীর্যককারক। সংস্কৃতে কর্তৃকারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল প্রথমা বিভক্তি। নব্যভারতীয় আর্যে প্রথমায় প্রায়ই শূন্য বিভক্তি দেখা যায়। এছাড়া তৃতীয়ার অবক্ষয়জাত বিভক্তিও নব্যভারতীয় আর্যে কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—সংস্কৃতে অনুক্ত কর্তায়

যে-তৃতীয়া বিভক্তির প্রচলন ছিল, থেকে বাংলায় কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রচলন বলে অনেকে মনে করেন। সংস্কৃত 'পুত্রেণ খাদ্যতে' > অপভ্রংশ 'পুত্তে খাইঅই' > বাংলা 'পুতে খায়'।

৪) অধিকাংশ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ থাকল না। বহুত্ববাচক পৃথক শব্দ দিয়ে অথবা ষষ্ঠী বিভক্তির অবক্ষয়িত রূপ দিয়ে বহুবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন, বাংলায় পুরুষ + এর (ষষ্ঠী বিভক্তি) = পুরুষের > পুরুষেরা।

৫) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একাধিক ধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগিক কালের রূপ দেখা দিল। যেমন— বাংলা √কর্ + ইয়া (এ) + √আছ্ + এ = করেছে। এখানে √কর্ ও √আছ্—দুই ধাতু মিলে একটি ক্রিয়া তৈরি করেছে।

৬) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ারূপের সরলীকরণ ঘটেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব ও পাঁচটি কালে ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য সাধিত হত পৃথক পৃথক বিভক্তি যোগ করে। নব্যভারতীয় আর্যভাষায় এসে শুধু কর্তৃবাচ্য ও কর্মভাববাচ্যে বর্তমানের বিভক্তি ঘটিত রূপ-স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে। ক্রিয়ার ভাবের ক্ষেত্রে বর্তমান কালের নির্দেশক ও অনুজ্ঞায় স্বতন্ত্র রূপ রক্ষিত হয়েছে। সর্বত্র নিষ্ঠা প্রত্যয়যোগে অতীতকালের এবং কখনো কখনো কৃত্য ('-তব্য') অথবা 'শতৃ' প্রত্যয়যোগে ভবিষ্যৎকালের পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। যেমন, 'চলিত' (√চল্) > বাংলায় 'চলি'।

৭) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় মূল ধাতুর (নিষ্ঠা অথবা শতৃ প্রত্যয়জাত) অসমাপিকার সঙ্গে 'অস্', 'ভূ' অথবা 'স্থা' ধাতুর পদ ব্যবহার করে যৌগিককালের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, গত + √অস্ > গিয়াছে।

(গ) অন্বয়তাত্ত্বিক :

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে গঠিত বাক্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোতেও কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের গঠনে পার্থক্য আছে। তবে ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কর্মবাচ্য পরিবর্তিত হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নব্যভারতীয় আর্যে কর্তৃবাচ্যে পরিণত হয়েছে। যেমন—

অস্মাভিঃ পুস্তিকা পঠিতা (কর্মবাচ্য) > আমি পুথি পড়ি (কর্তৃবাচ্য)।

২) বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের স্বতন্ত্র বিভক্তি চিহ্ন নব্যভারতীয় আর্যভাষায় অনেকক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। ফলে বাক্যে পদের অবস্থানটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেকারণে বাক্যে অনেকক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি পদের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই স্থান পরিবর্তন করে দিলে বাক্যের অর্থ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন, 'মানুষ কোনো কোনো বন্যপ্রাণী খায়'— এই বাক্যে 'মানুর্ষ' কর্তা,

'বন্যপ্রাণী' হল কর্ম। কিন্তু এই দুইয়ের অবস্থান পরিবর্তন করলে বাক্যটি হবে—'কোনো কোনো বন্যপ্রাণী মানুষ খায়।' এ'দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থের বাক্য।

৩.৬ ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব

দ্রাবিড় প্রভাব : আর্যভাষীরা যখন ভারতে আসে, তখন এদেশে দ্রাবিড় ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শুধু দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কন্নড় বা কানাড়ী, টোডা, কোটা, কোডগু, টুলু-ই নয়; উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশেও-যে তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব ছিল, তার প্রমাণ হল বালুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষা। তাই ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

সম্ভবত অর্বাচীন বেদ এবং ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী সংস্কৃত যুগের মধ্যবর্তী স্তরে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় (OIA) দ্রাবিড় শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। ঋগ্বেদে কিছু দ্রাবিড় শব্দ মেলে। যেমন— 'ময়ূর', 'কটুক', 'কুণ্ড', 'খল', 'দণ্ড', 'পিণ্ড', 'বল', 'বিল', 'উলূখল' ইত্যাদি। পরবর্তী সংহিতা যুগেও কিছু নতুন শব্দ মেলে। যেমন, অথর্ববেদে 'তূল', 'বিল্ব', 'মূসল' ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ-এও এই জাতীয় অনুপ্রবেশ লক্ষ করা যায়। যেমন, শতপথ ব্রাহ্মণে 'অর্ক', 'অলস', 'পণ্ডিত' ইত্যাদি। বৈদিক ভাষায় এইরকম আরও দ্রাবিড় শব্দের সন্ধান মেলে। যেমন— 'অণু', 'অরণি', 'কপি', 'কাল', 'কলা', 'গণ', 'নানা', 'নীল', 'পুষ্প', 'পূজা', 'বীজ', 'রাত্রি' ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন, ভারতীয় আর্যভাষার মূর্ধণ্য ধ্বনি ('ট্', 'ঠ্', 'ড্', 'ঢ্', 'ণ্') দ্রাবিড়ীয় প্রভাবে উৎপন্ন। ড. সুকুমার সেনের মতে, এ নেহাত অনুমান মাত্র। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে আসার আগেই 'ষ' ধ্বনিটির উদ্ভব হয়েছিল। দ্রাবিড় প্রভাব ছাড়াও অন্যত্র যেমন, সুইডিশ ভাষায় দন্ত্যধ্বনি থেকে মূর্ধণ্য ধ্বনি আপনিই উৎপন্ন হয়েছে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব পড়েছে গৃহীত শব্দাবলীর মাধ্যমে। খ্রি. ৫ম শতকের আগে দ্রাবিড় ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। অথচ তখনই দ্রাবিড় ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব প্রকট এবং সংস্কৃতে দ্রাবিড় শব্দ প্রচুর প্রবিষ্ট। প্রাকৃত ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়ার জায়গায় নামপদের (নিষ্ঠান্ত ও শত্রন্ত) ব্যবহারে হয়ত কিছু দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব থাকতে পারে। দ্রাবিড় প্রভাবের সাক্ষাৎ ফল পাওয়া যায় সংস্কৃত শব্দকোষে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যে প্রচুর দ্রাবিড়ীয় শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছিল।

কেউ কেউ মনে করেন যে, বাংলায় শব্দরূপে বহুবচনের 'গুলা', '-গুলি' বিভক্তি আসলে তামিল ভাষার বহুবচন '-গল' বিভক্তি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু ড. সুকুমার সেন এই মতকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। কারণ, বাংলায় ওগুলি বিভক্তি নয়—একটি বিশিষ্ট শব্দ এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আগে তা বহুত্ববাচক সমাসবদ্ধ পদে পরিণত হয়নি। ফলে, বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে অথবা পরে কোনো

দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না।

অস্ট্রিক প্রভাব : অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা একসময় সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত ছিল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই অস্ট্রিক ভাষা ভারতীয় আর্যভাষাকে, বিশেষত নব্যভারতীয় আর্যভাষাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। এই ভাষাগুলির কোনোটাই উন্নত নয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে কোনোটিরই লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় না।

নৃতাত্ত্বিকদের অনুমানে, আমাদের আচারে-বিচারে এবং জীবনদৃষ্টিভঙ্গিতে আর্যপূর্ব কোনো জাতির, হয়ত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর গভীর ও দৃঢ় প্রভাব আছে। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'যথেষ্ট উপকরণের অভাবে ভাষাগত প্রভাব নির্ণয় করা দুর্ঘট।' বৈদিক কাল থেকে অস্ট্রিক ভাষার অনেক শব্দ আর্যভাষা গ্রহণ করেছে বলে অনুমান করা হয়। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের অধিকাংশ দেশি শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে নেওয়া বলে অনুমান করা হয়। যেমন, 'খড়', 'খুঁটি', 'ঝিঙ্গা', 'চিঙ্গড়ি', 'ঢেঁকি', 'ডিঙ্গা', 'ডিম্ব', 'ঢিল', 'ঢিপি', 'মুড়ি' ইত্যাদি। 'খোকা', 'খুকি', 'কুড়ি' (বিশ অর্থে) ইত্যাদি শব্দও অস্ট্রিক ভাষাজাত। 'বঙ্গ' নামটিও হয়ত এই সূত্রেই আগত। সংস্কৃতেও কোনো কোনো বিশিষ্ট শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে আগত। যেমন, 'নারিকেল', 'তাম্বুল', 'কদলী', 'অলাবু' ইত্যাদি।

৩.৭ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. নব্যভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক কালব্যাপ্তিটি উল্লেখ করুন।

২. তিনটি নব্যভারতীয় আর্যভাষার নামোল্লেখ করুন।

৩. বহিরঙ্গ ভাষা কী?

৪. অন্তরঙ্গ ভাষা কাকে বলে?

৫. ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের কয়টি শাখা ও কী কী?

৬. দাক্ষিণাত্যের দুটি ভাষার নামোল্লেখ করুন।

৭. নব্যভারতীয় আর্যভাষায় পদান্ত স্বরধ্বনিলোপের একটি উদাহরণ দিন।

৮. দু'টি দ্রাবিড় ও দু'টি অস্ট্রিক শব্দের উদাহরণ দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝেন?

২. নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণকে কতদূর সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন?

৩. ভোজপুরী ভাষার উদ্ভবটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দিন।

৪. টীকা লিখুন : শৌরসেনী প্রাকৃত।

৫. নব্যভারতীয় আর্যভাষার ভৌগোলিক বর্গীকরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৬. নব্যভারতীয় আর্যভাষার উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৭. নব্যভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

রচনাধর্মী :

১. নব্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২. প্রাচীন, মধ্য ও নব্যভারতীয় আর্যভাষার একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. ভারতীয় আর্যভাষায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব কতখানি?

৪. নব্যভারতীয় আর্যভাষাকে কীভাবে বর্গীকরণ করা যায়, তা আলোচনা করুন।

একক ৪ ❑ বাংলা ভাষার উদ্ভব

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ বাংলা ভাষার উদ্ভব

৪.৪ অনুশীলনী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে জানতে পারবে।

৪.২ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর মোট বারোটি ভাষাবংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে কীভাবে ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটেছে, তা পূর্ববর্তী এককগুলিতে আগেই আলোচিত হয়েছে। বর্তমান এককে ভারতীয় আর্যভাষার সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ নব্যভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ধারাটি প্রদর্শিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার সুবিধার্থে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সারণি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎসের ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৪.৩ বাংলা ভাষার উদ্ভব

আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধানত বারোটি ভাষাবংশে বিভক্ত করা হয়। সেই ভাষাবংশের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশ। কারণ, প্রথমত এই ভাষাবংশ-থেকে-জাত আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষত ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়, শুধু ভৌগোলিক বিস্তারে নয়, এই ভাষাবংশ-থেকে-জাত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে মোট দশটি শাখার জন্ম হয়। এই শাখাগুলির মধ্যে শুধু ইন্দো-ইরানীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করত বলে, অনেকে শুধু ইন্দো-ইরানীয় শাখাটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে আর্য শাখা বলে থাকেন। যদিও ব্যাপক অর্থে সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকেই আর্য ভাষাবংশ বলা হয়।

ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়— ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য। ইরানীয়

উপশাখাটি ইরান-পারস্যে চলে যায়। আর, ভারতীয় আর্য উপশাখাটি ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের বিস্তৃতিকে ধারণ করে আছে এই আর্যভাষা।

প্রাচীন ভারতীয়, মধ্যভারতীয় স্তর পেরিয়ে আর্যভাষা উপনীত হয় তৃতীয় স্তর বা নব্যভারতীয় আর্যভাষায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্ঠের পরে এই ভাষা তৃতীয় স্তরে এসে একাধিক নব্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম দিল। যেমন— পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে মারাঠী, শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে হিন্দি, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে অবধী, মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে বাংলা ইত্যাদি ভাষার জন্ম হল।

অনেকেই মনে করেন, সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত। কারণ, সংস্কৃত ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যবংশের ভাষা। কিন্তু ভারতে আর্য-পূর্ব অস্ট্রিক, দ্রাবিড় বংশের ভাষা যেমন, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ইত্যাদি কখনোই সংস্কৃত-জাত নয়। দ্বিতীয়ত: পাঞ্জাবী, মারাঠী, হিন্দী, অবধী, বাংলা ইত্যাদি যেসব আধুনিক ভারতীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ থেকে জাত, সেগুলোর জন্মও ঠিক সংস্কৃত থেকে হয়নি।

সূক্ষ্ম বিচারে সংস্কৃত হল বৈদিকের পরবর্তী একটি সাহিত্যিক ভাষা— যা পরে মৃত ভাষায় পরিণত হয়। ফলে, জীবন্ত ভাষার মতো তার কোনো বিবর্তন হয়নি এবং তা থেকে কোনো ভাষার জন্ম হয়নি। বস্তুত, বৈদিক ভাষাই ছিল জীবন্ত ভাষা। এরই কথ্যরূপ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা-সহ অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্ম দিয়েছে। কাজেই, নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস হল বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ-থেকে-জাত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর বিভিন্ন অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন স্তর থেকে নানা পর্যায় পেরিয়ে কীভাবে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে, তা একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হলো।

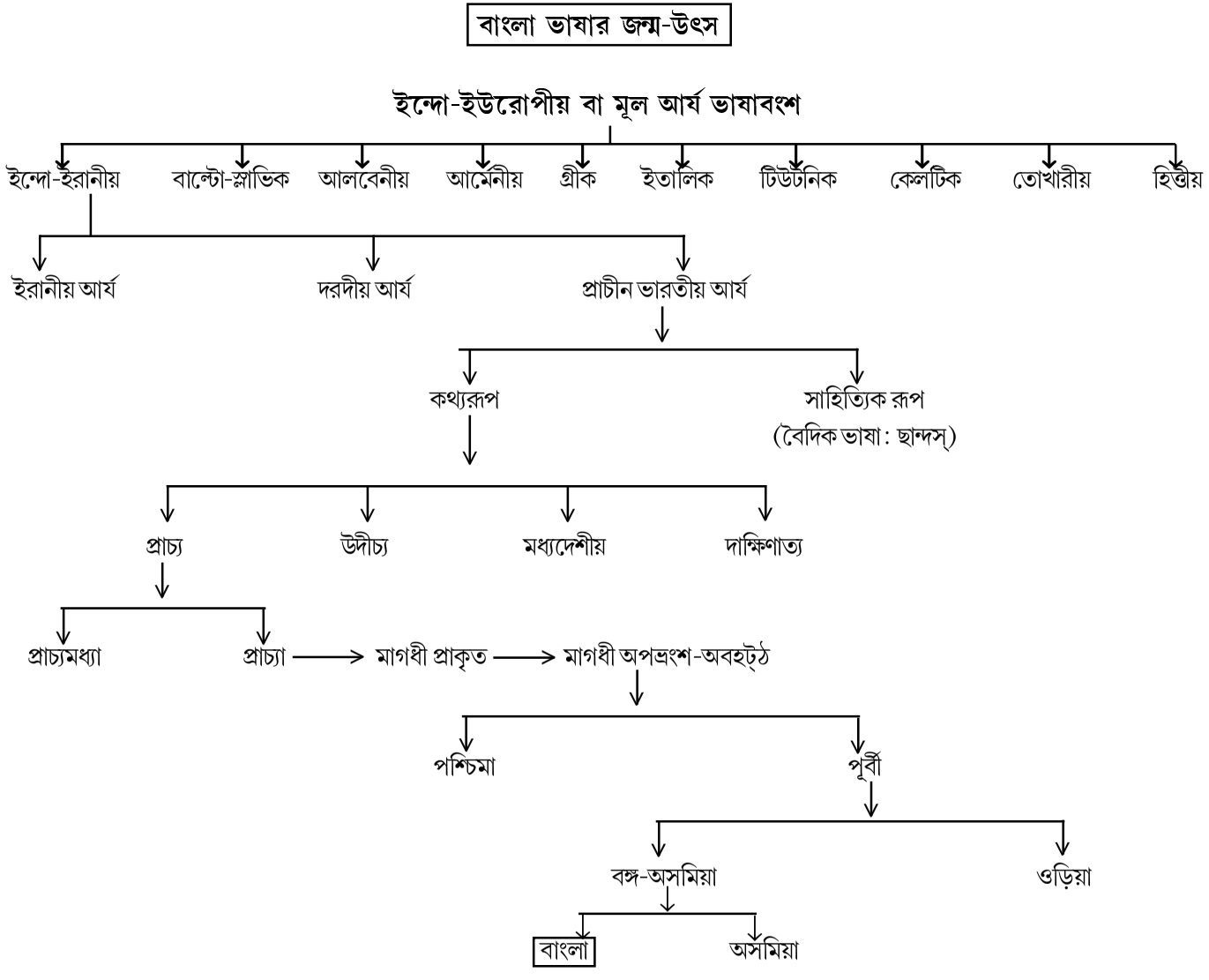

বাংলা ভাষার জন্ম-উৎস
ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশ
ইন্দো-ইরানীয়
বাল্টো-স্লাভিক
আলবেনীয়
আর্মেনীয়
গ্রীক
ইতালিক
টিউটনিক
কেলতিক
তোখারীয়
হিত্তীয়
ইরানীয় আর্য
দরদীয় আর্য
প্রাচীন ভারতীয় আর্য
কথ্যরূপ
সাহিত্যিক রূপ
(বৈদিক ভাষা : ছান্দস্)
প্রাচ্য
উদীচ্য
মধ্যদেশীয়
দাক্ষিণাত্য
প্রাচ্যমধ্যা
প্রাচ্যা
মাগধী প্রাকৃত
মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ
পশ্চিমা
পূর্বী
বঙ্গ-অসমিয়া
ওড়িয়া
বাংলা
অসমিয়া

পূর্বোক্ত বৃক্ষচিত্রটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পৃথিবীর মোট বারোটি ভাষাবংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ধারাটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারব।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের মোট দশটি শাখা। সেগুলি হল— ইন্দো-ইরানীয়, বাল্টো-স্লাভিক, আলবানীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক, ইটালিক, টিউটনিক, কেলটিক, তোখারীয় এবং হিত্তীয়। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তিনটি আর্যভাষা— (ক) ইরানীয় আর্য, (খ) দরদীয় আর্য এবং (গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুইটি রূপ—কথ্য এবং সাহিত্যিক। বৈদিক ভাষাগুলি হল সাহিত্যিক রূপের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপের শাখাটি আবার চারভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল—প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য। এগুলির মধ্যে প্রাচ্য শাখাটি আবার প্রাচ্যমধ্যা এবং প্রাচ্যা এই দুই শাখায় বিভক্ত। প্রাচ্যা শাখার মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছে মাগধী অপভ্রংশ এবং অবহট্‌ঠের। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের দুটি শাখা—পশ্চিমা এবং পূর্বী। এই পূর্বী শাখাটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—বঙ্গ-অসমিয়া এবং ওড়িয়া। বঙ্গ-অসমিয়া শাখাটি থেকেই বাংলা এবং অসমিয়া ভাষার উদ্ভব।

৪.৪ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি কোন্ দুটি উপশাখায় বিভক্ত?

২. মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোন্ শাখা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক রূপ কোন্‌টি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. 'সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম।'—মন্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার যুক্তি সাজান।

২. 'আর্য ভাষাবংশ' বলতে কী বোঝানো হয়?

রচনাধর্মী :

১. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাসটি রেখাচিত্রযোগে আলোচনা করুন।

মডিউল : ২

বাংলা ভাষার বিবর্তন, প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (ক), প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (খ)

একক ৫ ❑ বাংলা ভাষার বিবর্তন

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ বাংলা ভাষার যুগবিভাজন

৫.৪ বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব

৫.৫ অনুশীলনী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারবে। সেইসঙ্গে বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কেও তারা অবহিত হবে।

৫.২ প্রস্তাবনা

অব্যবহিত পূর্ববর্তী এককে আমরা দেখিয়েছি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় শাখা থেকে কীভাবে ক্রমান্বয়ে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ এবং সেখান থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। বর্তমান এককে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারাটি পরিবেশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার কালগত বিভাজন প্রদর্শনের পাশাপাশি এই ভাষায় কীভাবে অন্যান্য ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে, সেটিই এই এককের আলোচনার ভরকেন্দ্র।

৫.৩ বাংলা ভাষার যুগবিভাজন

আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসকে মূলত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

(১) প্রাচীন বাংলা (Old Bengali)

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali)

(৩) আধুনিক বাংলা (New Bengali)

(১) প্রাচীন বাংলা (Old Bengali) : আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই স্তরের কালসীমা। এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে, 'অমরকোষ'-এর সর্বানন্দ রচিত টীকায় প্রদত্ত চারশ'-রও বেশি বাংলা প্রতিশব্দে। এই স্তরের বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব হল দীর্ঘীভবন (ধর্ম > ধম্ম > ধাম), পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি (ভণতি >

ভণই), 'য়'-শ্রুতি ও 'ব'-শ্রুতি (নিকটে > নিয়ড্ডী); '-এর', '-অর', '-র' বিভক্তিযোগে সম্বন্ধপদ (রুখের তেন্তলি); '-ক', '-কে', '-রে' বিভক্তিযোগে গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের পদ (ঠাকুরক = ঠাকুরকে); '-ই', '-এ', -'হি', '-তে' বিভক্তিযোগে অধিকরণ (নিয়ড্ডী = নিকটে); '-এঁ' বিভক্তিযোগে করণ (সাদেঁ = শব্দের দ্বারা); বিভক্তির পরিবর্তে কিছু অনুসর্গের ব্যবহার (তোহোর অন্তরে = তোর তরে) ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন বাংলার বিস্তৃতিকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কারণ ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে রচিত বাংলা ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই এই পর্বটিকে 'অনুর্বর পর্ব' বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব' বলা যায়।

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali) : আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কালপর্বের বিস্তৃতি। বাংলা ভাষার এই মধ্য পর্বের বিস্তার সুদীর্ঘ প্রায় চারশ' বছর। এই পর্বটিকে দুটি উপপর্বে ভাগ করা যায়—

(ক) আদিমধ্য বাংলা (Early Middle Bengali) : এই কালপর্বের বিস্তার আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচনাকাল বিতর্কিত হলেও মোটামুটিভাবে এই রচনাটিকেই আদিমধ্য পর্বের বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শনরূপে ধরা হয়। এই পর্বের বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব আ-কারের পরবর্তী 'ই'/'উ' ধ্বনির ক্ষীণতা, সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে '-রা' বিভক্তি (আহ্মরা > আমরা), '-ইল'-যোগে অতীত কালের ও '-ইব' যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ গঠন (শুনিলোঁ, করিবোঁ), 'আছ্' ধাতু যোগে যৌগিককালের পদসৃষ্টি (লই + (আ)ছে > লইছে), পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা ছন্দ থেকে বহুপ্রচলিত পয়ার ছন্দের সৃষ্টি ইত্যাদি।

(খ) অন্ত্যমধ্য বাংলা (Late Middle Bengali) : আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কালপর্বের বিস্তৃতি। এই উপপর্বের ভাষার সমৃদ্ধ নিদর্শন মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা, বৈষ্ণব সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী পদান্তিক স্বরধ্বনির লোপ-প্রবণতা (রাম > রাম্), অপিনিহিতি (কালি > কাইল, করিয়া > কইর‍্যা), বিশেষ্যের কর্তৃকারকের বহুবচনে '-রা' বিভক্তি, নামধাতুর ব্যবহার (নমস্কার > নমস্কারিল), আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ও বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি।

(৩) আধুনিক বাংলা (New Bengali) : আনুমানিক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই যুগপর্বের বিস্তৃতি। বাঙালির মুখের বাংলা ভাষাই এই পর্বের বাংলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ ও খ্রিস্টান মিশনারীদের রচিত বাংলা গ্রন্থ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র- রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় এই আধুনিক বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাহিত্যিক ভাষার এই নিদর্শনের পাশাপাশি, পাঁচটি উপভাষাও এই কালপর্বের অবদান। সেগুলো হল, মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাঢ়ী', দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গের উপভাষা 'ঝাড়খণ্ডী', উত্তরবঙ্গের উপভাষা 'বরেন্দ্রী', পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা 'বঙ্গালী' এবং উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা 'কামরূপী' বা 'রাজবংশী'।

এগুলির মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী তথা কলকাতার নিকটবর্তী পশ্চিমবাংলার রাঢ়ী উপভাষার উপরে ভিত্তি

করেই শিক্ষিত জনের সর্বজনীন আদর্শ চলিত বাংলা বা Standard Collaquial Bengali-র রূপ গড়ে উঠেছে।

আধুনিক বাংলা ভাষার দুটি প্রধান বিশেষত্ব হল, সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যে গদ্যরীতির ব্যাপক ব্যবহার।

এই স্তরে চলিত বাংলার প্রধান বিশেষত্ব হল— অভিশ্রুতি (করিয়া > কইর‍্যা > কর‍্যে > করে), স্বরসঙ্গতি (দেশী > দিশি), বহুপদী ক্রিয়ারূপ (গান করা, জিজ্ঞাসা করা), ফারসি 'ব' (wa) থেকে আগত 'ও'-এর সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহার (রাম ও শ্যাম), বহু ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ, নতুন নতুন ছন্দোরীতি ও গদ্যছন্দের প্রতিষ্ঠা।

বাংলা ভাষার ইতিহাসের যুগবিভাজনটি নীচের ছকে (রামেশ্বর শ', পৃ. ৬২৬) প্রদর্শিত হল—

চর্যাগীতি ইত্যাদি	৯০০ - ১২০০ খ্রি.		**প্রাচীন বাংলা**
অনুর্বর পর্ব	১২০০ - ১৩৫০ খ্রি.	অন্ধকারযুগ	(OB)
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	১৫০০ খ্রি.	আদি মধ্য	
বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদি	১৭৬০ খ্রি.	অন্ত্যমধ্য	**মধ্য বাংলা** (MB)
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খ্রিস্টান মিশনারীদের লেখা, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের রচনা ও মৌখিক বাংলা	১৭৬০ খ্রি. থেকে বর্তমান কাল		**আধুনিক বাংলা** (NB)

৫.৪ বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব

বাংলা শব্দ মূলত দুই প্রকার— মৌলিক এবং আগন্তুক। মৌলিক শব্দ বলতে বোঝায় ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আগত বা গৃহীত শব্দাবলীকে। আর, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, সেমীয় ইত্যাদি অসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর ভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শাখান্তর থেকে পরে গৃহীত শব্দগুলিই হল আগন্তুক শব্দ।

মৌলিক শব্দগুলি মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত—তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম। 'জল', 'বায়ু', 'আকাশ', 'মানুষ', 'গৃহ', 'কৃষ্ণ', 'অন্ন'—ইত্যাদি হল তৎসম শব্দ; 'ওঝা', 'নীতি', 'খাজা', 'গায়', 'ঢাকা' ইত্যাদি হল তদ্ভব শব্দ। অর্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ হল 'কেষ্ট', 'রাত্তির' ইত্যাদি।

বাংলায় আগন্তুক শব্দ দুই প্রকার— দেশি ও বিদেশি। বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি, তুর্কী, ওলন্দাজ, ইংরেজি ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দঋণ রয়েছে বাংলা ভাষায়। যেমন— 'আন্দাজ', 'খরচ', 'কম', 'বেশি' (ফারসি), 'আইন', 'আক্কেল', 'হুকা', 'বিদায়' (আরবি), 'আলখাল্লা', 'উজবুক', 'উর্দু', 'কাঁচি', (তুর্কী), 'হরতন', 'রুইতন', 'ইস্কাবন' (ওলন্দাজ), 'লাট', 'আপিস', 'গেলাস', 'বাক্স' (ইংরেজি)।

৫.৫ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলার আনুমানিক কালব্যাপ্তি উল্লেখ করুন।

২. মধ্য বাংলা কোন্ দুটি পর্বে বিভক্ত?

৩. আধুনিক বাংলা ভাষার একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করুন।

৪. বাংলার মৌলিক শব্দ কোন্‌গুলি?

৫. বাংলায় বিদেশি আগন্তুক শব্দের দুটি উদাহরণ দিন।

৬. প্রাচীন বাংলার বিস্তৃতিকাল উল্লেখ করুন।

৭. প্রাচীন বাংলার প্রধান সাহিত্যিক নিদর্শন কোন্‌টি?

৮. সর্বানন্দের 'অমরকোষ টীকা'য় আনুমানিক কত বাংলা শব্দ পাওয়া গেছে?

৯. আদি-মধ্যবাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন কোন্‌টি?

১০. বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মধ্যযুগের কোন্ স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. আদি-মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. বাংলা ভাষার কালগত বিভাজনটি সারণিযোগে বুঝিয়ে দিন।

৩. অন্ত্য-মধ্য বাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন:

১. বাংলা ভাষায় বিবর্তনের ক্রমটি সুস্পষ্ট করুন।

২. বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. আদি-মধ্য ও অন্ত্য-মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্টের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক ৬ ❑ প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (ক)

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ বাংলা ভাষার নিদর্শন

৬.৪ প্রাচীন বাংলা-র ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৬.৫ অনুশীলনী

৬.১ উদ্দেশ্য

প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা-কেন্দ্রিক এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে। পাশাপাশি প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শনগুলির সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে তাদের।

৬.২ প্রস্তাবনা

প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার বিস্তৃত কালপর্বে-প্রাপ্ত বিবিধ সাহিত্যিক নিদর্শন যেমন, চর্যাগীতি থেকে শুরু করে 'অমরকোষ'-এর টীকা ইত্যাদি এই এককে উল্লিখিত হয়েছে। পাশাপাশি, মূলত চর্যাগীতিকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করা হয়েছে।

৬.৩ প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন

প্রাচীন বাংলা ভাষার বিস্তৃতিকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বের মধ্যে রচিত বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে— এমন কোনো বাংলা রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাই ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বটিকে অনুর্বর পর্ব বা barren period বলা হয়। এই পর্বের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে এর ভাষাবৈশিষ্ট্যও আমরা জানতে পারি না। তাই এই পর্বটিকে অন্ধকার যুগও বলা হয়। সে কারণে, এই পর্বটিকে বাদ দিয়েই অনেকে বলে থাকেন, প্রাচীন যুগের বিস্তারকাল হল ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়াদের রচিত চর্যাগীতিগুলিতে।

চর্যাগীতি ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর যেসমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলো নিতান্তই নগণ্য। অমর সিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান-কল্প গ্রন্থ 'অমরকোষ'-এর টীকা রচনা করেছিলেন বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ। এতে যে প্রায় চারশ' বাংলা শব্দ আছে, সেগুলিকে প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে ধরা হয়। আর, 'সেকশুভোদয়া'-য় সংকলিত যে দু'-চারটি বিচ্ছিন্ন বাংলা গান পাওয়া যায়, সেগুলিকেও প্রাচীন বাংলার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আছে বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল'-এ দু'-চারটি বাংলা ছড়া ও কবিতা।

৬.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সমীভূত হয়ে সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। যেমন, পর্বত > পব্বত, বা, জন্ম > জম্ম।

প্রাচীন বাংলায় এই যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লুপ্ত হল। যেমন পব্বত > পবত, জম্ম > জম। এই লোপের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হল। যেমন—

পবত (প্ + অ + ব্ + অ + ত্ + অ) > পাবত (প্ + আ + ব্ + অ + ত্ + অ)

বা

জম (জ্ + অ + ম্ + অ) > জাম (জ্ + আ + ম্ + অ)

এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্ধতৎসম শব্দে। সেখানে সমীভূত যুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়নি। যেমন, মিথ্যা > মিছা।

নাসিক্যব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত যুক্তব্যঞ্জনও অনেক সময় সমীভূত হয়নি; তা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়েছে। যেমন— বন্ধ > বান্ধ, চন্দ্র > চান্দ।

২) নাসিক্যব্যঞ্জন অনেকক্ষেত্রে লোপ পেল এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেল। যেমন, শব্দেন > সাদেঁ।

৩) পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি বজায় ছিল, অর্থাৎ দু'টি মিলে একটি স্বরে পরিণত হয়নি। যেমন, উদাস > উআস। কিন্তু পদের অন্তে অবস্থিত একাধিক স্বর যৌগিক স্বররূপে উচ্চারিত হত এবং ক্রমে দুটি মিলে একক স্বরে পরিণত হল। যেমন—ভণতি > ভণই, পুস্তিকা > পোথিআ > পোথী।

৪) পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝখানে প্রায়ই 'য়'-ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি রূপে এসে যেত। যেমন, নিকটে > নিঅড্ডী > নিয়ড্ডী > নিয়ডি।

৫) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই হ-কারে পরিণত হত। যেমন, মহাসুখ > মহাসুহ, কথন > কহন।

৬) 'শ্'-এর স্থানে 'স্'-এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস (< আশা), সুনুপাখ (শূন্যতা পাখা) ভিড়ি লাহু রে পাস (পাশ)।

৭) চর্যাপদে 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণ ছিল আধুনিক উচ্চারণের তুলনায় সম্ভবত আরও বিবৃত (Open)। সেকারণেই হয়তো চর্যার লিপিবিধিতে শব্দের আদিস্বরে শ্বাসাহত (stressed) স্থানে 'অ'/'আ'-ধ্বনির বিপর্যয় দেখা যায়। যেমন— অইস/আইস, কবালী/কাবালী, সমাঅ/সামাঅ ইত্যাদি।

৮) ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল— পদমধ্য 'হ'-ধ্বনির উচ্চারণ সংরক্ষণ (যেমন—'খণহ', 'তহিঁ' 'করহু' ইত্যাদি) এবং মহাপ্রাণ বর্ণ, বিশেষত 'হ্ম', 'হ্ন', 'ঢ'-এর অস্তিত্ব (যেমন—'আহ্মে', 'কাহ্নু', 'দিঢ' ইত্যাদি)। চর্যাপদে সম্ভবত ওড়িয়াসুলভ 'ল' ধ্বনি বজায় ছিল। অন্ত্যমিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—'হেলেঁ', 'ডাল', 'ডালী' ইত্যাদি।

৯) চর্যাপদে অপভ্রংশ-অবহট্ঠের মতোই স্বর-সংযোগ দেখা যায়, অর্থাৎ সেখানে স্বরসংকোচ সর্বত্র ঘটেনি। যেমন— 'অমিঅ', 'আইস', 'চিঅরাঅ', 'করউ' ইত্যাদি। তবে, স্বরসংকোচের উদাহরণও বিরল নয়। যেমন—'তৈলোএ'/'তেলোএ', 'ইন্দিঅ'/'ইন্দি', 'জাইউ'/'জাউ', 'করিঅ'/'করি' ইত্যাদি।

১০) চর্যায় মধ্য বাংলাসুলভ অপিনিহিতির উদাহরণ মেলে না; তবে স্বরসংগতির দু'-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, সুসুরা < শ্বশুর, ঘিনি < ঘেণেলি ইত্যাদি।

১১) নাসিক্যব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনের সরলীভবন দেখা যায়। পূর্বস্বর দীর্ঘত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে আনুনাসিক হয়ে গেছে— যদিও তা সর্বত্র চিহ্নিত হয়নি। সম্ভবত চর্যাপদে আনুনাসিকতা পুরোপুরি ঘটেনি। নাসিক্যব্যঞ্জন ছিল ক্ষীণ। তাই অনেক সময় পূরক দীর্ঘত্ব ও নাসিক্যব্যঞ্জন পাশাপাশিই অবস্থান করেছে। যেমন—'চন্দ'/'চান্দ', 'ভন্তি'/'ভাংতি'/'ভান্তী', 'তন্তে'/'তান্তি' ইত্যাদি।

৬.৫ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. প্রাচীন বাংলা ভাষার আনুমানিক বিস্তৃতিকাল কত?

২. কোন্ পর্বটিকে 'অনুর্বর পর্ব' বলে চিহ্নিত করা হয়?

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোন্‌টি?

৪. অমর সিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান-কল্প গ্রন্থের নাম কী?

৫. প্রাচীন বাংলা ভাষায় যুগ্মব্যঞ্জন লোপের একটি উদাহরণ দিন।

৬. প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি উদাহরণ দিন যেখানে যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়েছে।

৭. চর্যাগীতিতে প্রাপ্ত স্বরসংগতির একটি উদাহরণ দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. টীকা লিখুন : প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন।

২. 'ভণতি' > 'ভণই'—এই উদাহরণটি প্রাচীন বাংলার কোন্ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত, ব্যাখ্যা করুন।

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষায় কীভাবে নাসিক্যব্যঞ্জনের সরলীভবন ঘটেছে, তা বুঝিয়ে দিন।

রচনাধর্মী :

১. প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

একক ৭ ❑ প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (খ)

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৭.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৭.৫ অনুশীলনী

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৭.২ প্রস্তাবনা

এই এককের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এককে প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে প্রাচীন বাংলার অন্য দুই ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে পরিবেশিত হল। কারক-বিভক্তি সর্বনাম, ক্রিয়া, বাচ্য ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিকে পৃথকভাবে রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে দুটি ধারায় আলোচিত—লিঙ্গ-সৌষম্য এবং অনুক্ত কর্তার প্রয়োগ।

৭.৩ প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

অ. কারক-বিভক্তি :

১. প্রাচীন বাংলা ভাষায় কারক ছিল মুখ্যত দু'টি— মুখ্য কারক এবং গৌণ কারক। সংস্কৃতের শূন্য বিভক্তি, প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিজাত রূপ হল মুখ্য কারকের। আর, তৃতীয়া থেকে সপ্তমী বিভক্তিজাত রূপ হল তীর্যক বা গৌণ কারকের।

২. কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি বা বিভক্তিহীনতা প্রাচীন বাংলায় লক্ষ করা যায়। যেমন, 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল'—এখানে 'কাল'-এ শূন্য বিভক্তি। কখনো কখনো অনির্দিষ্ট কর্তায় '-এ' বিভক্তির প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন, 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ'—এখানে 'কুম্ভীরে'-তে '-এ' বিভক্তি।

৩. করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি ছিল '-এঁ'। এটির উৎস '-এন'। যেমন, 'মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিত্তা ('মতিএঁ'-তে 'এঁ' বিভক্তি)।

৪. করণ ও অধিকরণকারক প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে। ফলে অধিকরণেও প্রায়ই একই বিভক্তি চোখে পড়ে। যেমন—'ঘরেঁ'। অবশ্য অধিকরণকারকে অন্যান্য বিভক্তিও ছিল। যেমন '-ই' বিভক্তি ('**নিঅড়ি**' বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক'), '-এ' বিভক্তি ('চঞ্চল **চীএ** পইঠো কাল'), 'তেঁ' বিভক্তি ('সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই, **সুখদুখেতেঁ** নিচিত মরিঅই'), 'ত' বিভক্তি ('**হাঁড়িত** ভাত নাহি নিতি আবেশী') ইত্যাদি।

৫. অধিকরণের বিভক্তিগুলির মধ্যে '-এ' বিভক্তির প্রয়োগ ছিল ব্যাপক— এতটাই যে, অন্যান্য কারকের অর্থ প্রকাশ করার জন্যেও এই বিভক্তির ব্যবহার ছিল। যেমন— কর্তৃকারকের অর্থে, 'কানেট **চোরে** নিল কা গই মাগঅ'। আবার, অপাদানের অর্থে, '**জামে** কাম কি কামে জাম'।

৬. সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল '-এর', '-র', '-ক'। যেমন, '**রুখের** তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ' (গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়'), '**মোহোর** বিগোআ কহণ ন জাই' (আমাদের মিলনসুখের কথা বলা যায় না), 'এড়িএউ **ছান্দক** বান্ধ করণক পাটের আস' (ছন্দের বন্ধ ও ইন্দ্রিয়পটুতার আশা ত্যাগ করো)।

৭. তির্যক বিভক্তি ছাড়া অপাদান কারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল '-হুঁ'। যেমন, 'রঅণহুঁ' (< রত্নাৎ = রত্ন থেকে)।

৮. বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করার জন্য যেসব শব্দ বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত হয়, অথচ যেগুলি বিভক্তির মতো মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় না, সেগুলিকে অনুসর্গ বলে। এই অনুসর্গের ব্যবহার প্রাচীন বাংলাতেই সূচিত হয়েছিল। চর্যাপদে অনুসর্গীয় বিভক্তিগুলির প্রয়োগ সংক্ষেপে এইরকম—

-ক/কে (গৌণকর্ম ও সম্বন্ধ) : **নাশক** থাতী, **ছান্দক** বান্ধ, **বাহবকে** পারই ইত্যাদি।

-কু (গৌণকর্ম) : মকুঁণঠা।

-রে/রেঁ (গৌণকর্ম) : রস রসানেরে কংখা ইত্যাদি

-ত/তে (করণ-অপাদান-অধিকরণ) : **সুখদুখেতেঁ, ডোম্বিত** আগলী।

নামবাচক অনুসর্গ : ডোম্বী এর সাঙ্গে, তঁই বিনু, গঅণ মাঝেঁ

অসমাপিকা অনুসর্গ : দিআ চঞ্চালী, দিঢ করি, কণ্ঠে লইআ ইত্যাদি।

আ. সর্বনাম :

সংস্কৃত করণ কারকের বহুবচনের পদ অস্মাভিঃ (>প্রাকৃত অম্হাহি > অপভ্রংশ অম্হহি) থেকে

আগত অম্হে (আম্হে, আম্ভে, অম্হে, অম্ভে) প্রাচীন বাংলাতেই কর্তৃকারকের একবচনের পদরূপে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। সংস্কৃত করণকারকের বহু বচন পদ তুষ্মাভিঃ (> প্রাকৃত তুম্হাহি > অপভ্রংশ তু হহি) থেকে আগত পদ 'তুম্হে' প্রাচীন বাংলায় কর্তকারকের একবচনের পদরূপে কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ই. ক্রিয়া :

১. ক্রিয়ারূপে বর্তমানকালের বিভক্তি ছিল উত্তম পুরুষে '-মি', '-হুঁ'। মধ্যম পুরুষে '-স' এবং প্রথম পুরুষে '-ই'। যেমন— 'হা লো ডোম্বী তো **পুছমি** সদ্ভাবে। **আইসসি জাসি** ডোম্বি কাহারি নাবেঁ।' (হাঁ রে ডোমনী, তোকে সাদামনে একটা কথা জিজ্ঞেস করি— তুই কার নৌকোয় আসা যাওয়া করিস রে), কিংবা 'লুই **ভণই** গুরু পুচ্ছিঅ জাণ' (লুই বলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।)

২. অতীতকালের ক্রিয়ারূপ গঠন করা হত দু'ভাবে—নিষ্ঠান্ত পদ দিয়ে এবং ধাতুর সঙ্গে 'ল' বা '-ইল' প্রত্যয় যোগ করে। যেমন—নিষ্ঠান্ত পদের সাহায্যে √গম্ + ক্ত = গত > গঅ > গউ ('সমহর গউ নিবাণে' = শশধর নির্বাণে গত হল)

প্র— √বিশ্ + ক্ত = প্রবিষ্ট > পাইট্ঠ > পইঠ পইঠো ('চঞ্চল চীএ পইঠো কাল' = চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল)

'ল'/'ইল' প্রত্যয় যোগ করে = √দেখ্ + ইল = দেখিল ('মই দেখিল' = আমি দেখিলাম)

√গম্ + ল = গেল ('সসুরা নিদ গেল = শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়ল)

'-ল'/'-ইল'-যুক্ত ক্রিয়ারূপগুলি প্রথমে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে বিধেয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হত। এইজন্যে এইগুলির পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে পৃথক রূপ হত। যেমন— 'সসুরা নিদ **গেল**' (পুংলিঙ্গ) 'সবরী নিচেতন **ভইলী**' (স্ত্রীলিঙ্গ)।

৩. ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হত '-ইব' যোগে। যেমন—'মই ভাইব' (আমি ভাবব)

৪. অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত তিনভাবে—ধাতুর সঙ্গে 'নিষ্ঠা' প্রত্যয় যোগে নিষ্ঠান্ত পদ রচনার পর তার সঙ্গে '-এ' বিভক্তি যোগ করে (√চড়্ + ইল = চড়িল, চড়িল + এ = চড়িলে; 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বামে মা হোহী' অর্থাৎ সাঁকোতে চড়লে ডাইনে-বামে ঘুরো না), '-অন্ত' যোগে পদ গঠনের পর তার সঙ্গে '-এ' বিভক্তি যোগ করে (√বুড়্ + অন্ত = বুড়ন্ত, বুড়ন্ত + এ = বুড়ন্তে; 'মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা' অর্থাৎ আমি এখন বুড়িয়ে যাওয়াতে কিছু দেখতে পাই না), এবং '-ই', '-ইঅ' বা 'ইআ' প্রত্যয় যোগ করে। যেমন— 'দিঢ় **করিঅ** মহাসুহ পরিমাণ লুই ভণই গুরু **পুছিঅ** জান'। অর্থাৎ দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ করো, লুই বলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জানো।

৫. যৌগিক কাল বা compound tense-এর উদাহরণ চর্যায় মেলে না। যদিও যৌগিক ক্রিয়া বা compound verb-এর ব্যবহার বেশ সুলভ। 'উঠি গেল', 'টুটি গেলি', 'গুণিআ লেহুঁ' ইত্যাদি।

ঈ. বাচ্য :

প্রাচীন বাংলায় ভাববাচ্য বা passive voice-এর প্রয়োগ ছিল। যেমন— 'নাব ন ভেলা দীসই' (< সং দৃশ্যতে), 'দুহিএ' (< দুহ্যতে)। ভাববাচক বিশেষ্যের সঙ্গে সংস্কৃত 'যা' ধাতুজাত পদ যোগে যৌগিক কর্মবাচ্য গঠন এখানেই প্রথম দেখা যায়। যেমন, 'কহন ন জাই' (= ন কথ্যতে)।

৭.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. লিঙ্গ-সৌষম্য (Gender concord) :

১. **সাক্ষাৎ বিশেষণ ও নামপদ :** 'চঞ্চল চীএ', 'নিঘিণ কাহ্ন'; কিন্তু 'দিঢ়ি টাঙ্গী', 'নিশী অন্ধারী', 'একেলী শবরী'। অর্থাৎ, নামপদের লিঙ্গ অনুসারে অন্যান্য পদের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

২. **সম্বন্ধ বিশেষণ (-'র'/'রি') ও নামপদ :** 'রুখের তেন্তলি', 'হরিণির নিলঅ'; কিন্তু 'হাড়েরি মালী', 'মহামুদেরী কংখা', 'চান্দেরী চান্দকান্তি', 'গুঞ্জরী মালী'। অর্থাৎ, নামপদ অনুসারে কোথাও 'সম্বন্ধ' বোঝাতে 'র' বা 'রি'-এর প্রয়োগ ঘটেছে।

৩. **সর্বনাম বিশেষণ (-'র'/'রি') ও নামপদ :** 'মোহোর বিগোআ', 'জৌবন মোর', 'জাহের বাণচিহ্ন'; কিন্তু 'তোহোরি কুড়িআ', 'মেরি তইলা বাড়ি', 'বাষণা মোরি' ইত্যাদি। অর্থাৎ, নামপদ অনুসারে সর্বনাম-বিশেষণে কোথাও '-র' বা কোথাও -'রি' যুক্ত হয়েছে।

৪. **কৃদন্ত বিশেষণ ('ল'/-'লি') ও নামপদ :** 'মাতেল চীঅ-গঅন্দা', 'পইঠেল গরাহক', 'বেঢ়িল হাক'; কিন্তু 'মেলিলী কাচ্ছি', 'বুড়িলা মাতঙ্গী', 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী'। অর্থাৎ নামপদ অনুসারে 'ল' বা -'লি' যোগে কৃদন্ত বিশেষণ তৈরি হয়েছে।

৫. **কৃদন্ত ক্রিয়াপদ ('-ল'/-'লি') ও কর্তৃপদ :** 'চলিল কাহ্ন', জিতেল ভঅবল'; কিন্তু 'রাতি পোহাইলী', 'আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী', 'ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী' ইত্যাদি। অর্থাৎ এখানেও নামপদ বা কর্তৃপদ অনুসারে '-ল' বা -'লি'-যোগে ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হয়েছে।

খ. অনুক্ত কর্তার প্রয়োগ (Passive Construction) :

চর্যায় ব্যবহৃত অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কৃদন্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল (Past participle ও Future Tense) হল কর্তার বিশেষণ ও কর্তৃবাচক। কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অতীত বা ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ কর্মের বিশেষণ ও কর্মবাচক। কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক প্রয়োগে তাই যথাক্রমে কর্তা ও উক্ত কর্ম অনুযায়ী লিঙ্গ ধারণা আরোপিত হত। যেমন— 'চলিল কাহ্ন' (= চলিতঃ কৃষ্ণঃ), 'রাতি

পোহাইলী' (= রাত্রিঃ প্রভাতিতা), 'লাগেলি আগি' (= অগ্নিকা লগ্নিতা)। কিন্তু 'মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী' (= ময়া অস্থিমালিকা গৃহীতা), 'মই ভইব' (= ময়া ভাবিতব্যম), 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (= ময়া দাতব্য পৃচ্ছা)।

৭.৫ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত কারকের সংখ্যা কয়টি?

২. প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিভক্তিহীনতার একটি উদাহরণ দিন।

৩. প্রাচীন বাংলায় 'হুঁ' বিভক্তি কোন্ কারকে ব্যবহৃত হত?

৪. একটি নামবাচক অনুসর্গের উদাহরণ দিন।

৫. প্রাচীন বাংলা ভাষায় নিষ্ঠান্ত পদ যোগে অতীত কালের একটি ক্রিয়ারূপের গঠন দেখান।

৬. '-রি' যোগে প্রাচীন বাংলার একটি সম্বন্ধ পদের উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

১. টীকা লিখুন : প্রাচীন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অনুসর্গ।

২. প্রাচীন বাংলা ভাষায় সর্বনামের প্রয়োগ উদাহরণ-যোগে বুঝিয়ে দিন।

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষায় কীভাবে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. প্রাচীন বাংলা ভাষায় অনুক্ত কর্তার প্রয়োগ উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

রচনাধর্মী :

১. প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

নোটস্

মডিউল : ৩

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (ক), মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (খ), আধুনিক বাংলা ভাষা

একক ৮ ❑ মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (ক)

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৮.৪ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৮.৫ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

৮.৬ সারাংশ

৮.৭ অনুশীলনী

৮.১ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা এর আগে প্রাচীন যুগের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জেনেছে। বর্তমান এককে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদি স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তারা জানতে পারবে। মধ্য-বাংলার অন্ত্যস্তরীয় ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী এককে আলোচিত হয়েছে।

৮.২ প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে এই এককে তিনটি আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও ছন্দোরীতিগত। প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আলোচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে উদাহরণযোগে তা বিশ্লেষণ করার। পাশাপাশি প্রাচীন যুগের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মধ্যযুগের আদি-স্তরীয় বাংলার পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

৮.৩ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

সাধারণত মধ্য বাংলাভাষার ব্যাপ্তি ধরা হয়, ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকালের দুই প্রান্তীয় কালসীমার কোনোটিই তর্কাতীত নয়। এর সূচনাকাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ড. সুকুমার সেন। তাঁর মতে, 'চতুর্দশ শতাব্দে ও পঞ্চদশ শতাব্দে লেখা বলিয়া নিশ্চিতভাবে নেওয়া যাইতে পারে, এমন কোনো রচনা মিলে নাই। সুতরাং ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ অবধি শতাব্দ কালের কতটা প্রাচীন বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল এবং কতটা আদি-মধ্য বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া

বলিবার উপায় নাই।' [সেন, ডঃ সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৭৮-১৭৯] অন্য প্রান্তটি সম্পর্কেও তিনিই তর্কের অবতারণা করেছেন। বলেছেন, 'শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখিলে অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের শেষসীমা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। তবে সেই সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহারের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ ধরিতে হয়।'

মধ্যযুগের সমাপ্তিকাল প্রসঙ্গে বলা যায়, মানুষের মুখনিঃসৃত মধ্যযুগের জীবন্ত কথ্যভাষার নিদর্শন পাওয়ার এখন আর কোনো উপায় নেই। শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার রূপ ধরেই এই পর্বের বাংলা ভাষার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যাবে। সেদিক থেকে দেখলে, মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুসালটিকেই (১৭৬০) মধ্যযুগের সমাপ্তিলগ্ন বলে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ মধ্যযুগের আনুমানিক বিস্তৃতিকাল ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই প্রায় চারশ' বছর ধরে কোনো জীবন্ত ভাষা অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। সেই পরিবর্তনের চিহ্ন অনুসারে এই পর্বকে দু'টি উপপর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে—

ক) আদি-মধ্য (১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)

খ) অন্ত-মধ্য (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একমাত্র প্রামাণ্য নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এছাড়া মোটামুটিভাবে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং কয়েকটি মঙ্গলকাব্যকেও এই পর্বের রচনা বলে ধরা হয়। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই এই পর্বের শেষের দিকের রচনা এবং এগুলির ভাষা পরবর্তীকালে এত বেশি পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল যে, এগুলিকে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রামাণ্য নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যায় না। তাই মূলত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ওপর নির্ভর করে এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করা হয়।

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) 'অ'-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ। যেমন— 'আতি', 'আকারণ'।

২) যৌগিক স্বরের দ্বিস্বর রূপে উচ্চারণ— 'কইল', 'বউল'।

৩) স্বরসংগতির বাহুল্য— রণুঝণু/রুণুঝুণু, এখণী/এখুণী।

৪) 'আ'-কারের পরস্থিত 'ই'-কার ও 'উ'-কার ধ্বনির ক্ষীণতা। পাশাপাশি-অবস্থিত দুটি ধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয়টি, বিশেষত দ্বিতীয়টি যদি পদের শেষ ধ্বনি হয়, তাহলে সেটি ক্ষীণ উচ্চারিত হতে পারে। তার ফলে পাশাপাশি-অবস্থিত দুই ধ্বনি মিলিয়ে মৌলিক স্বরের (dipthong)-এর সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু সেদিক থেকে বিচার করলে দুই স্বরের সংযোগে-সৃষ্ট শুধু 'আই' বা 'আউ' নয়; এরকম আরো বহু নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়। যেমন—আওঁ ('জাওঁ'), এউ ('দেউ'), ইআঁ

('পসিআঁ'), ইঅ ('তিঅজ'), অএ ('রএ'), এআ ('বেআকুলী'), ওআ ('গোআলিনী'), আই ('নাইল'), আএ ('বাএ', 'রাএ') ইত্যাদি।

রামেশ্বর শ'-এর মতে, '...শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় পাশাপাশি দুই স্বরের স্থিতি, তার বৈশিষ্ট্য এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষীণতা সম্বন্ধে আমরা অসংশয়িত নই। মনে হয় এসব ক্ষেত্রে যে স্বরসংযোগ পাই তা থেকেই পরবর্তীকালের বাংলার বিভিন্ন যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল।'

৫) কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, নাসিক্যব্যঞ্জনের সংযোগে-গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের 'সরলীভবন' আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন কান্তি > কাঁতি, ঝম্প > ঝাঁপ।

কিন্তু এখানেও ডঃ রামেশ্বর শ' ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, '...এই বৈশিষ্ট্যটিও সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য (যৎ) করা যায় না। এর বহুল ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। যেমন— 'চন্দ্রাবলী', 'কুম্ভার', 'নন্দন', 'নিন্দ', 'আহ্মি', 'ব্রহ্মা', 'কান্দো' ইত্যাদি। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তদ্ভব শব্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণের প্রবণতা সূচিত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু সেটি তখনও ব্যাপক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে নি।'

৬) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথবা ক্ষীণতা আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য— এমন সিদ্ধান্ত করেছেন কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী। অর্থাৎ 'হ'-কার যুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন থেকে 'হ'-কার লোপ পেয়েছে। যেমন— হ্ন (ন্হ) > ন এবং হ্ম (ম্হ) > ম। যেমন— কাহ্ন > কানু, আহ্মি > আমি।

এখানেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন ডঃ রামেশ্বর শ'। লিখছেন, '...এই বৈশিষ্ট্যটিকেও এ যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ "কানু" ও "আমি" শব্দের চেয়ে বরং "কাহ্ন" ও "আহ্মি" শব্দের প্রয়োগই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশী [যৎ] এবং "হ্ন", "হ্ম" প্রভৃতি ধ্বনিসংযোগ ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। যেমন— "কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী", "গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুটী গোআলিনী", "তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে", "কাহ্নাঞি বাঁশীত দিল সানে", "বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ", "আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী", "পুছিল তোহ্মরা কেহ্নে তরাসিলা মণে", "তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ কিছু লাজ", "কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত" ইত্যাদি।

৮.৪ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি বা বিভক্তিহীনতা— 'শীতল মনোহর বাঁশি কে না বাএ' বা 'ডালত বসিএঁা যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রায়ে।'

২) আদি-মধ্যযুগের বাংলায় মুখ্য কর্মেও বিভক্তিহীনতা দেখা যায়— 'অরেরে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোড়ি ডগমগ কুগই ন দেহি'। 'তুঁহ এখনই সন্তার দেই জো চাহসি সো লেহি'।

৩) গৌণকর্মে ও সম্প্রদানে '-ক', '-কে', '-রে' বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন—'কংসকে বুলিয়ে কন্যা আঁকাসে থাঁকিয়া', 'হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া', 'যমুনাক যাই ছলে পানী আণিবার', 'সাপেরে করিয়াঁ বিষদানে।'

৪) পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের সাহায্যে অপাদানের অর্থ প্রকাশ করা হত। যেমন— 'গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী'। 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'।

৫) সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশের জন্যে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল '-এর', '-র', '-ক', '-কের'। যেমন— 'বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে', 'যে কামে হএ কুলের খাঁখারে', 'ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী', 'উত্তম জনের নেহা হেন মুরারি', 'চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক ভিতে', 'আনাথী নারীক কত থাকে অভিমান', 'আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ', 'তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে'।

৬) অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হত '-তঁ', '-তে', '-এ'। যেমন— 'রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান', 'মদনবাণে পরাণে আকুলী ল'।

৭) উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল 'আহ্মে'—'মো' এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ—তোহ্মে ইত্যাদি। এগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন কারকের বিভক্তি-চিহ্ন যোগ হত।

৮) সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে '-রা' বিভক্তি যুক্ত হত। যেমন— 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'। 'পুছিল তোহ্মরা কেহ্নে তরাসিলা মনে'।

৯) ক্রিয়া-বিভক্তির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় বর্তমানকালের উত্তমপুরুষে '-ওঁ', '-ই'; অতীতকালে '-লোঁ', '-ইল' এবং ভবিষ্যৎকালে '-ইব' বিভক্তি। যেমন— 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী', 'ধরিবাক না পারোঁ পরাণী', 'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাওঁ', 'একসরী হৈলোঁ মাত্র হেন ঘোর বনে', 'ছাড়িলোঁ মো মাহাদান তেজিলাঁ মো বাটে, 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা', 'দাসী হআঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা'।

১০) কৃদন্ত অতীতকালের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের ব্যাপক প্রয়োগ— 'গেলী রাহী', 'বড়ায়ি চলিলী'।

১১) বহু বচনে '-রা' প্রত্যয়ের অতিসীমিত প্রয়োগ, তাও কেবল উত্তম ও মধ্যমপুরুষের সর্বনামের ক্ষেত্রে—'আহ্মারা', 'তোহ্মারা'। অন্ত্য-মধ্য বাংলাসুলভ '-গুলা', '-গুলি', '-দিগ', '-দিগের' ইত্যাদি বহুবচন প্রত্যয়ের প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মেলে না।

১২) অসমীয়াসুলভ সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণের পদ— 'জৈসাণে', 'তৈসাণে' কেবল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই মেলে।

১৩) ধাতুর সঙ্গে 'ই', 'ইআঁ', 'ক', 'ইতেঁ', 'ইলে' ইত্যাদি যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ রচিত হত। যেমন—

'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাঁও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।'
'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজকুমুতার হার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর।...
যোগিনীরূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর।'
'অযোড়-যোড়ন আক্ষে করিবাক পারি,
সে কি রাধিকা ভৈল সীতা সতী নারী।'
'যে দেবস্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতি
স দেব সনে নেহা বাঢ়াইলে হয়ে বিষ্ণুপুরে স্থিতি।'
'এ বার কাহ্নাঞি' বড় কৈল উপকার।
জরমে সুঝিতেঁ নারো এ গুণ তাহার।।'
'যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পানি।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলে মধুর বানী।'

৮.৫ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

অপভ্রংশের বিশিষ্ট ছন্দ পাদাকুলকে প্রতিপদে ছিল ষোলো মাত্রা। তা থেকে অর্বাচীন অপভ্রংশের ছন্দ চতুষ্পদীর জন্ম হয়। পাদাকুলকের একমাত্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চতুষ্পদীর প্রতি পদে দাঁড়ায় পনেরো মাত্রা। চতুষ্পদী থেকে বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হয় চর্যাগীতিতে। আদি-মধ্য বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চতুষ্পদীর একমাত্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পয়ারে দাঁড়িয়েছিল প্রতি পদে চোদ্দ মাত্রায়। যেমন—

'যমুনার তীরে রাধা / কদমের তলে। = ৮ + ৬

তরল করিলেঁ কেহ্নে / নয়ন যুগলে।।' = ৮ + ৬

এই পয়ার ছন্দই আদি-মধ্য বাংলার প্রধান ছন্দ। এছাড়া নানা ছাঁদের ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়।

৮.৬ সারাংশ

মধ্যযুগের আদি স্তরের বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কে গ্রহণ করা হয়। সেটির ভিত্তিতেই এই যুগের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক এবং ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

৮.৭ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. মধ্যযুগের বাংলার ভাষার আনুমানিক বিস্তৃতিকাল কত?

২. মধ্যযুগের বাংলা ভাষাকে কোন্ দুটি স্তরে বিভক্ত করা যায়? সেগুলি কী কী? দুটি স্তরের কালসীমা উল্লেখ করুন।

৩. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কীভাবে যৌগিক স্বর দ্বিস্তররূপে উচ্চারণ হয়েছে, একটি উদাহরণ দিন।

৪. একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিন কীভাবে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি প্রচলিত ছিল।

৫. আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রধান ছন্দোরীতিটির নামোল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।—এই মন্তব্যকে আপনি কতদূর সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন?

২. আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার যে কোনো তিনটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

৩. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার যে-কোনো তিনটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

২. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

৩. ছন্দোরীতিগত দিক থেকে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আলোচনা করুন।

একক ৯ ❑ মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (খ)

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ মধ্য বাংলা : অন্ত্য স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৯.৪ মধ্য বাংলা : অন্ত্য স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৯.৫ মধ্য বাংলা : অন্ত্য স্তরের ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

৯.৬ মধ্য বাংলা : অন্ত্য স্তরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

৯.৭ সারাংশ

৯.৮ অনুশীলনী

৯.১ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা পূর্বের এককটিতে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদি স্তরের বিবিধ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জেনেছে। বর্তমান এককে অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্যসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তারা জানতে পারবে।

৯.২ প্রস্তাবনা

অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি এই এককে চারটি আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়েছে— ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, ছন্দোরীতিগত ও বিবিধ। প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আলোচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে উদাহরণযোগে তা বিশ্লেষণ করার। এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা আদি-মধ্যযুগের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও অন্ত্য-মধ্যযুগের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা করতে সক্ষম হবে।

৯.৩ মধ্য বাংলা : অন্ত্য স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

অন্ত্য-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের বাংলা ভাষা নানাভাবে সমৃদ্ধ। এই পর্বেই লেখা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি। এই সমস্ত রচনায় এই যুগের বাংলা ভাষার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি

একে একে আলোচিত হল—

প্রথমেই ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—

১) পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত 'অ'-কার লোপ পেল। যেমন— "আর্ শূন্যাছ আলো সই গোরাভাবের কথা। / কোণের্ ভিতর্ কুলবধূ কান্দ্যা আকুল্ তথা।।"

ডঃ রামেশ্বর শ' এই সূত্রের ব্যতিক্রমও চিহ্নিত করেছেন। যেমন— 'তৈল বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান / শিশু কান্দে ওদনের তরে।'

২) পদের অন্তে যুক্তব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত 'অ'-কার লোপ পায়নি। সেটি অবিকৃতরূপেই উচ্চারিত হত। যেমন— 'মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস। / অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বারো মাস।"

৩) পদের অন্তে অবস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী 'অ'-কার ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনিও রক্ষিত হয়েছে। যেমন—'বিশেষে বামন জাতি বড় দাগাদার। / আপনারা এক জপে আরে বলে আর।'

৪) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বর অনেকক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। যেমন— হরিদ্রা > হল্‌দি। 'হল্‌দিবরণ গোরাচাঁদ পড়্যা গেল মনে'। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিও মধ্য বাংলায় ব্যাপক বিস্তৃতি পায়নি। বরং এর বিপরীত দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যায়। যেমন— "হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা। / যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা।।"

৫) অন্ত্য-মধ্যযুগে শব্দমধ্যস্থ 'ই' বা 'উ' অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে এসেছে। 'উ' কখনো কখনো 'ই'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—বেগুন > বেউগণ > বাইগণ ('শাক বাইগণ মূলা আট্যা-থোড় কাঁচকলা / সকলে পুরিয়া লয় পাতি।।")

কখনো কখনো বিপর্যাস বা অপিনিহিতির ফলে আগে-সরে-আসা 'ই' বা 'উ' লোপ পেয়েছে। যেমন—রাখিয়াছি > রাইখ্যাছি > রাখ্যাছি। 'গোধিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল-দড়া। ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শীক পোড়া।।"

যদিও অধিকাংশক্ষেত্রে অপিনিহিতির পূর্ববর্তী রূপই দেখা যায়। যেমন— 'কইর‍্যা' বা 'কর‍্যা'-র বদলে 'করিয়া' রূপই বেশি— 'করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া / আজ্ঞা মোরে করিলা পার্বতী।'

৬) মহাপ্রাণ নাসিক্য (অর্থাৎ বর্গের 'হ'-যুক্ত পঞ্চম বর্ণ) অল্পপ্রাণ (অর্থাৎ বর্গের 'হ'-বিহীন পঞ্চম বর্ণ) বর্ণে পরিণত হতে আরম্ভ করেছিল আদি-মধ্যযুগের বাংলাতেই। অন্ত্য-মধ্যযুগে এসে এই

প্রবণতা ব্যাপকতর হল। যেমন— আহ্মি > আমি, তুহ্মি > তুমি, আহ্মার > আমার, তোহ্মার > তোমার।

"দড় বেঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি
মারয়ে পিঁড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি।"
"আনের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।"

কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, 'ঢ়'-এরও মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। অর্থাৎ 'ঢ়' হয়েছে 'ড়'। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য অন্ত্য-মধ্যযুগের শেষদিকেও যে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এমন নয়। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের লেখাতেই পাই— 'ওরে বুঢ়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। / হের বর কেমনে আনিল চক্ষু খেয়ে।।'

৯.৪ মধ্য বাংলা : অন্ত্য স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) ব্যাকরণগত লিঙ্গানুশাসনের অবলুপ্তি ঘটেছে এখানে।

২) নামমূলক কর্তার বহুবচনে '-রা' বিভক্তি (যদিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল সর্বনাম শব্দেই প্রাপ্তব্য) এবং নির্দেশক বহুবচনে '-গুলা', '-গুলি' প্রত্যয়ের ব্যবহার (সাফল্যবাচক বা তুচ্ছার্থক) এবং তীর্যক কারকের বহুবচনে '-দি', '-দিগ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ। যেমন— 'কে বলে শারদ শশী ও মুখের তুলা।/পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।।' '-দিগ' আবির্ভূত হয়েছে সম্ভবত সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে।

৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তৃকারকের, আহ্মে/তোহ্মে (> অন্ত্য-মধ্য বাংলায় আমি/তুমি, তোমি) একবচন ও বহুবচনে সমান্তরালভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু অন্ত্যস্তরে পদগুলির একবচনে স্থানান্তর সম্পূর্ণ হয়েছে। গৌণ কারকের 'আহ্মা'-/'তোহ্মা-' > 'আমা-'/'তোমা-' সর্বনামমূলক সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। যেমন— 'দড় বেঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি/মারয়ে পিঁড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি'। কিংবা 'আনের আছয়ে অনেক জনা/আমার কেবল তুমি।'

৪) গৌণ কারকে 'মোহ'-/'তোহ-' (< মভ্যম্ / তুভ্যম্) সর্বনামমূলের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। কর্তৃকারকের 'মো-'/'আমা-', 'তো-'/'তোমা-'—এই প্রাচীন সর্বনামগুলির মধ্যে 'মো-' ক্রমশই অপ্রচলিত এবং 'তো-' হয়ে উঠেছিল তুচ্ছার্থবাচক।

৫) সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম-কর্তার প্রসার ঘটে। যেমন— তিঁহি/তিনি, ইঁহো/ইনি।

৬) মুখ্য ও গৌণ কর্মকারকের প্রকৃত পার্থক্য দু'-চারটি রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ ব্যতীত এই স্তরে লুপ্ত হয়েছে।

৭) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল '-র', '-এর' ইত্যাদি। যেমন— 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।/পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।' বা 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।/যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।'

৮) 'য়', '-এ', '-তে' সপ্তমী বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত হতে থাকে। যেমন, 'উই চারা খাই বনে জাতিতে ভালুক।/নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।' কিংবা, 'ধূলায় ধূসর হয়্যা কান্দয়ে হস্তিনী।/মিথ্যা বর দিয়া কেন বধ কর প্রাণী।।"

৯) অন্ত্য-মধ্য বাংলায় ক্রিয়াপদের পরিবর্তনই ঘটেছে সর্বাধিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় তার বৈচিত্র্যসম্ভারও অনেক বেশি। অন্ত্য-মধ্য বাংলা ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যগুলি নানারূপ। যেমন—

মধ্য-বাংলায় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ কর্মবাচ্য থেকে উদ্ভূত বলে পদগুলি মূলত বিভক্তিহীন রয়ে গেছে। বিশেষত প্রথম ও উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে এই বিভক্তিহীনতা আদি স্তরেই লভ্য। যেমন, (আম্মে) করি/করিল/করিব ইত্যাদি। কিন্তু ক্রিয়ার পুরুষবাচক বিভক্তি গ্রহণ অন্ত্যস্তর-সূচক। যেমন—

মধ্য-বাংলা	বর্তমানকাল	অতীতকাল	ভবিষ্যৎকাল
আদি	আম্মে করিএ/করী	আম্মে করিল/কৈল	আম্মে করিব
অন্ত্য	আমি করি	আমি করিলাঙ/করিলুঁ কৈলাম/কৈনু	আমি করিমুঁ/ করিবাম্

১০) অনেকসময় প্রথম পুরুষের বিভক্তিহীন পদও সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হত। কারণ এই বিভক্তিহীন পদগুলো ছিল মূলত কর্মবাচক এবং কর্তার সঙ্গে সম্পর্কহীন। যেমন— 'তাঁরা রহে একপাশ', 'তিহোঁ সুনাইব', 'বড় লজ্জা পাইল তিহোঁ'।

১১) অন্ত্য-মধ্যবাংলায় কখনো কখনো বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালে সাধারণ বিভক্তিও তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হত। যেমন— 'তোরা প্রাণ যদি চাহ', 'তোরা ঝাঁপ দিবে জলে, 'তোরা মরেছিলে' ইত্যাদি।

১২) অন্ত্য-মধ্য বাংলায় অতীতকালে মধ্যম পুরুষে '-ইলা' বিভক্তির প্রচলন হয়ে উঠেছিল ব্যাপক— যা ছিল ঈষৎ সম্ভ্রমার্থক। ভবিষ্যৎকালের প্রথম পুরুষের বিভক্তি '-ইবে' অন্ত্য-মধ্য বাংলায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর তুলনায় অনেক ব্যাপক। তবে, মধ্যম পুরুষের '-ইবা' বিভক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মেলে না।

যেমন—

উত্তম পুরুষ : "সেই পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।"

প্রথম পুরুষ: "ধনি ধনি কলিকালে রত্না নদীর কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম
তীর্থ কৈলা সেই ত নগর।।"

সাধারণ ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল '-ইব'। যেমন—

'সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি কবির পসার।।'

১৩) কিছু সংস্কৃত নামশব্দকে ক্রিয়ার ধাতুরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করা হত। নামধাতুর এই বহুল ব্যবহার অন্ত্য-মধ্য বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন, নমস্কার + ইলা = নমস্কারিলা।

১৪) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সঙ্গে √আছ্ যোগ করে যৌগিক কালের রূপ গঠন করা হত। যেমন 'গোধিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল দড়া।/ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শীক-পোড়া।।'

১৫) কোনো একটি ধাতুর পরিবর্তে যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন অন্ত্য-মধ্য বাংলার বহু তদ্ভব ধাতুকে অপ্রচলিত করে দিয়েছে। যেমন, 'জিনা' স্থলে 'জয় করা'; 'হুনে' স্থলে 'হোম করে' ইত্যাদি। এছাড়া পাই 'বাহুড়া' ও 'নেওটা'। এর অর্থ 'ঘুরিয়া বা ফিরিয়া আসা'। 'বুলা' অর্থে 'চলিয়া বেড়ানো', 'পিয়া' অর্থে 'পান করা', 'বসা' অর্থে 'বাস করা', 'গোড়া' অর্থে 'পিছু পিছু যাওয়া' বা 'অনুগমন করা'—এগুলির প্রয়োগও অন্ত্য-মধ্য স্তরের বাংলায় লক্ষ করা যায়।

৯.৫ মধ্য বাংলা : অন্ত্য স্তরের ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

অন্ত্য-মধ্য স্তরের বাংলায় পয়ার ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ কাহিনিমূলক রচনা ছাড়াও উচ্চাঙ্গের দার্শনিক রচনায় পয়ার ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ছাঁদের ত্রিপদী ছন্দেরও প্রয়োগ ছিল। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিতায় অপভ্রংশের চতুষ্পদী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়।

৯.৬ মধ্য বাংলা : অন্ত্য স্তরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

১) মধ্য যুগে বাংলা ভাষা ছিল মুসলমান শাসিত। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্ত্য-মধ্য বাংলার

প্রথম পর্বে বহু পরিমাণে আরবি, ফারসি, তুর্কী শব্দের এবং শেষ পর্বে বেশ কিছু পর্তুগীজ শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে বাংলা ভাষায়, যেমন—আরবি শব্দ হল 'গজব', 'আজব', 'আদমি', 'আইন', 'কেতাব', 'খাজনা' ইত্যাদি। ফারসি শব্দ যেমন— 'দার' (ডিহিদার), 'গিরি' (বাবুগিরি), 'গোলাপ' (< গুলাব) ইত্যাদি। তুর্কী শব্দের ক্ষেত্রে যেমন 'খাঁ', 'খাতুন', 'দারোগা', 'বিবি', 'বেগম' ইত্যাদি বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ভারতচন্দ্রের লেখাতেই এর উদাহরণ মেলে। যেমন— 'পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।/গজব করিলে তুমি আজব কথায়।।/লস্করে দু'-তিন লাখ আদমি তোমার।/হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর।।'

২) ব্রজবুলি ভাষা। 'মিথিলার কবি বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদ এক সময় বাঙালির খুব প্রিয় ছিল। এরই মাধ্যমে বাংলা ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। মূলত মৈথিলী ভাষা ও অংশত অবহট্‌ঠ ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে অন্ত্য-মধ্যযুগের বাঙালি বৈষ্ণব কবিরা একটি সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি করেন। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে এই কৃত্রিম কাব্যভাষায় অজস্র রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লেখা হয়েছিল। ব্রজবুলির মূলে আছে এই অবহট্‌ঠ ভাষা। আসাম ও বাংলা ছাড়া অন্যত্র ব্রজবুলির চর্চা ফলপ্রসূ হয়নি। ব্রজবুলির ছন্দ অবহট্‌ঠ ও মৈথিলীর মতোই মাত্রামূলক।

বৈষ্ণবপদে ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'যাঁহা পহুঁ অরুণা চরণে চলি যাত।/তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।/যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।/হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ।'

৯.৭ সারাংশ

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্ত্যস্তরের নিদর্শন হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবনীকাব্য, মঙ্গলকাব্য, অন্নদামঙ্গল, অনুবাদ গ্রন্থ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত সেগুলির ভিত্তিতেই এই যুগের বিবিধ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৯.৮ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার কালসীমা উল্লেখ করুন।

২. শ্বাসাঘাতের ফলে স্বরধ্বনি লোপের একটি উদাহরণ দিন।

৩. একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিন যে, অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কীভাবে অল্পপ্রাণীভবন প্রচলিত ছিল?

৪. নামধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বা শব্দবিভক্তিযোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে—অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা থেকে এরকম একটি উদাহরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

২. টীকা লিখুন : ব্রজবুলি।

৩. মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্ত্যস্তরে কীভাবে বিবিধ বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল?

৪. অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষায় কীভাবে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচলিত ছিল?

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

২. মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্ত্যস্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৩. মধ্যযুগের বাংলা ভাষার দুটি স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার পার্থক্য উদাহরণযোগে নির্দেশ করুন।

একক ১০, ১১ ❑ আধুনিক বাংলা ভাষা

গঠন

১ উদ্দেশ্য

২ প্রস্তাবনা

৩ আধুনিক বাংলা ভাষা : পর্ব বিভাজন

৪ আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৫ সারাংশ

৬ অনুশীলনী

১ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা এর আগে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জেনেছে। বর্তমান এককে তারা আধুনিক যুগের বিবিধ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

২ প্রস্তাবনা

আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার বিস্তৃত কালপর্বকে কয়েকটি ভাগে এই এককে বিভক্ত করা হয়েছে। এরপর আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক এবং ছন্দোরীতিগত নানা বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীরা এই এককটি পাঠ করলে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।

৩ আধুনিক বাংলা ভাষা : পর্ব বিভাজন

আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে আধুনিক বাংলার গোড়াপত্তন শুরু হয়েছে। গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় এই আধুনিকতার সূত্রপাত। ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের বিচারে বাংলা ভাষা প্রাচীন যুগ থেকে বিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা বিস্তীর্ণ। ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার এই আধুনিক বাংলা ভাষাকে কয়েকটি কালপর্বে বিভক্ত করেছেন। যেমন—

১. সূচনা পর্ব (১৫০০ - ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ)

২. উন্মেষ পর্ব (১৭৪৩ - ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)

৩. অভ্যুদয় পর্ব (১৮১৮ - ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

৪. বিকাশ পর্ব (১৮৪৭ - বর্তমান কাল)

অনেক ভাষাতাত্ত্বিকই স্বাভাবিক কারণে এই যুগবিভাজন মেনে নিতে পারেন নি। কারণ, মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়কালকেই বাংলা ভাষায় মধ্যযুগের সমাপ্তি এবং আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে মনে করা হয়। অর্থাৎ, আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের বিস্তৃতিকাল।

১। সুচনাপর্ব (১৫০০ - ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ) :

অষ্টাদশ শতকের বাংলার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব। যদিও, গদ্যের পরিচিতি বাংলা ভাষায় একেবারে নতুন নয়। কারণ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রচিত বাংলা গদ্যেরও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। এগুলি প্রধানত বৈষ্ণব সাধকদের কারিকা, কুলজীগ্রন্থ বা দেহ-কড়চা জাতীয় প্রশ্নোত্তরমালা অংশ (মৌলিক অথবা অনুবাদ), চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংক্রান্ত বৈষয়িক রচনা অথবা নাটকীয় সংলাপ-আশ্রিত মৌখিক রচনাংশ। যেমন, ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে লিখিত কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের পত্র, গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদারকে লিখিত জনৈক অহোমরাজের লেখা চিঠি (১৬৩১ খ্রি.), ঢাকা অঞ্চলের উপভাষায় লেখা প্রাচীন চুক্তিপত্র (১৬৯৬ খ্রি.), নরোত্তমদাসের দেহকড়চা (১৬৮১-৮২ খ্রি.) গোপীচন্দ্র নাটকে উল্লিখিত নাটকীয় সংলাপ (১৭শ শতক) ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতকে রচিত গদ্যনিবন্ধও দুর্লভ নয়। যেমন, ১৭৭১-এ ছেলে গুরুদাসকে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি, গৌড়ীয় মোহান্তদের লেখা ইস্তফা ও পরাজয় পত্র, ১৭৩১-এ সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের 'অজয়পত্র', 'ভাষা পরিচ্ছেদ'-এর অনুবাদের সূচনা অংশ (১৭৭৪-৭৫ খ্রি.), 'ঙমহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্য গল্পের রচনাংশ (১৮শ শতক) ইত্যাদি।

তবে, বাংলা হরফে সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা হল, হালহেড্ রচিত বাংলা ব্যাকরণে উদ্ধৃত একটি পত্র (১৭৭৮ খ্রি.)

২। উন্মেষ পর্ব (১৭৪৩-১৮১৮ খ্রি.):

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা গদ্যের প্রগতি ও ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলেও বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্বের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটল ১৭৪৩ খ্রি. থেকে। রোমান হরফে লিখিত হলেও বাংলা গদ্য প্রথম স্থিরত্ব লাভ করল ১৭৪৩-এ; সেইসঙ্গে সূচিত হল বাংলা গদ্যে বিদেশী প্রভাব। গদ্য রচনার লেখক হিসেবে বিধর্মী লেখকেরা প্রধানত ধর্মপ্রচারকরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই প্রশ্নোত্তরমূলক বৈষ্ণবীয়

কড়চা-নিবন্ধগুলিই তাঁদের সাহিত্যিক রচনার আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছিল। তাই বাংলা গদ্যের অনুশীলন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অস্বীকার করা চলে না। তাঁরা বাংলা সাহিত্যে যে-নতুন যুগ আনলেন, সেই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথমত, ইউরোপীয় ভাষার প্রভাব বাংলা গদ্যে দেখা দিল। বাংলা শব্দভাণ্ডারে পর্তুগীজ ও ইংরেজি শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ ভাষাকে করল সমৃদ্ধ। বাংলা বাক্যগঠনেও ইউরোপীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ করা গেল।

দ্বিতীয়ত, বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য প্রভাবেই পল্লবিত হয়ে উঠল। চিঠিপত্র ও দলিলের যুগ অতিক্রম করে বাংলা গদ্য বিচিত্র বিষয়ে অনুপ্রবেশ করল। ফলে, সংস্কৃত, ইংরেজি, অথবা যেকোনো প্রাদেশিক ভাষায় রচিত বিভিন্ন বিষয়ধর্মী গ্রন্থের অনুবাদ, প্রচারপুস্তিকা, আইনগ্রন্থের অনুবাদ, ব্যাকরণ, বর্ণপরিচয়, অভিধান বা শব্দকোষ, পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞানমূলক রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা যেকোনো সমৃদ্ধতর ভাষার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল।

তৃতীয়ত, ধর্মীয় প্রচার সর্বজনীন করে তোলার তাগিদে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকরা বাংলা ভাষার আঞ্চলিক কথ্য বা মৌখিক রূপটি সাহিত্যে আমদানি করলেন। বাংলার প্রাচীন গদ্যে সেই নিদর্শন মেলে।

চতুর্থত, ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বাংলা ভাষার মৌখিক ও বৈষয়িক গদ্যরীতি অযথা 'যাবনীমিশাল' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলা গদ্যে এই আরবি-ফারসির অযথা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধাচরণ করলেন এই বিদেশী সুধীসমাজ। বস্তুত, ১৭৭৮-এ হালহেড্ ও পরবর্তীকালে হেনরি পিট্স্ ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরী প্রমুখ বিদ্বজ্জনের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যে আরবি ফারসির বদলে স্থান পেতে শুরু করল প্রকৃত বাংলা ও সংস্কৃত। তাঁদেরই সমবেত প্রয়াসে বাংলা লিখিত গদ্যের একটি পরিশীলিত সাধু আদর্শ গড়ে উঠল। পাশাপাশি, বাংলা গদ্যে তৎসম শব্দের বানানে যে নির্বিকার স্বেচ্ছাচারিতা চলছিল, কেরী প্রমুখের প্রচেষ্টায়, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ফলে, বিশেষত মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারে, বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বানানপদ্ধতির বিশুদ্ধিকরণ ঘটল।

পঞ্চমত, বাংলা গদ্য সর্বপ্রথম ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হল। রোমান হরফে লেখা হলেও বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩ খ্রি.)। ইংরেজি ভাষায় লিখিত হালহেড্-এর বাংলা ব্যাকরণে (১৭৭৮ খ্রি.) মুদ্রিত বাংলা হরফ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হল এবং বাংলা মুদ্রণ অক্ষরের স্রষ্টা হলেন স্যার চার্লস্ উইলবিন্স্— যাঁর কাছে শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার বাংলা হরফ তৈরি করা শিখেছিলেন।

বাংলা গদ্যরীতির ধারায়, এই পর্বের লেখক ও তাঁদের রচনাগুলি হল—

১. দোম আন্তোনিও-দো রোজারিও : ব্রাহ্ম-রোমান-ক্যাথলিকসংবাদ:

সম্ভবত ১৭৩৫ সালে রচিত, ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত। মানোএল-দা-আস্সুম্পসাওঁ ছিলেন এর

সম্পাদক। এটি পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। পর্তুগালের লিসবন থেকে এটি মুদ্রিত হয়েছিল।

২. মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাওঁ: (ক) কূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। এটি ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে লিসবন থেকে মুদ্রিত। (খ) বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণ। এটি সম্ভবত ১৭৩৪ সালে রচিত। লিসবন থেকেই ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত।

৩. নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড্ রচিত বাংলা ব্যাকরণ: A Grammar of the Bengal Language: এটি হুগলী থেকে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত।

৪. জোনাথান ডানকান: দেওয়ালি আইন সংক্রান্ত ইম্পে কোডের বঙ্গানুবাদ। (Regulations for the Administrations of Justice in the Courts of DewaneeAdaulut। এটি ১৭৮৫-তে কলকাতার The Honourable Company's Press থেকে মুদ্রিত।

৫. নীল বেঞ্জামিন এডমন্‌স্টোন: ফৌজদারী আইন সংক্রান্ত অনুবাদ (Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates)। এটি ১৭৯২-এ কলকাতার The Honourable Company's Press থেকে মুদ্রিত।

৬. হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার: (ক) আইন সংক্রান্ত কর্ণওয়ালিস কোডের বঙ্গানুবাদ। এটি ১৭৯৩-এ কলকাতা থেকে মুদ্রিত। (খ) ইংরেজী বাঙলা শব্দকোষ এবং বাঙলা-ইংরেজী শব্দকোষ (A Vocabulary in Two Parts, English & Bengali and vice versa)—প্রথম খণ্ড ১৭৯৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০১। এটি কলকাতার কেরিস এণ্ড কোম্পানীজ প্রেস থেকে মুদ্রিত।

৭. এ. আপজন: ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি। কলকাতার দি ক্রনিকল প্রেস থেকে ১৭৯৩ সালে এটি মুদ্রিত।

৮. জন মিলার: The Tutor বা 'সিক্ষ্যাগুরু'। এটি ১৭৯৭ সালে প্রকাশিত। মুদ্রণস্থল সম্ভবত কলকাতা।

তবে, ১৮০০ সালে ওয়েলেসলি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটল। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। ফলে, বাংলা ভাষায় প্রথম পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তন হল। এই পাঠ্যপুস্তকগুলি মূলত লিখেছিলেন কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকগণ। কিন্তু এর প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.)। কেরীর নিজস্ব বাংলা রচনা কোন্‌গুলি, তা আর বোঝার কোনো উপায় নেই। কারণ, অধিকাংশ বই কেরীর নামে প্রকাশিত হলেও সেগুলি মূলত ছিল যৌথসৃষ্টি। এই জাতীয় প্রধান রচনাগুলি হল—

১. 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' (১৮০০ খ্রি.) : মুদ্রণস্থল শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত

প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ এটি। এটি টমাস ও রামরাম বসু কর্তৃক অনূদিত ও কেরী কর্তৃক সংশোধিত।

২. সমগ্র নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ (১৮০১ খ্রি.) : এটির সম্পাদক উইলিয়াম কেরী হলেও অনুবাদ করেন টমাস, রামরাম বসু, কেরী ও ফাউন্টেন। কেরীর জীবদ্দশায় এটির মোট আটটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৩. ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুবাদ (৪ খণ্ডে) (১৮০২-১৮০৯) : এটি টমাস-রামরাম বসু-ফাউন্টেন-মার্শম্যান প্রমুখ কর্তৃক মূল হিব্রু ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত, মুদ্রণস্থল শ্রীরামপুর।

৪. বাংলা ব্যাকরণ: A Grammar of the Bengalee Language byWilliam Carey। এটি ১৮০১-এ প্রকাশিত ও কেরীর জীবদ্দশায় এটির মোট চারটি সংস্করণ হয়েছিল।

৫. বাংলা-ইংরেজি অভিধান: A Dictionary of the Bengalee Language। এটির দু'টি খণ্ড। প্রথমটি ১৮১৮ ও দ্বিতীয়টি ১৮২৫-এ প্রকাশিত।

৬. কথোপকথন (Dialogues) : শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮০১-এ প্রকাশিত।

৭. ইতিহাসমালা: শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮১২ সালে প্রকাশিত।

এছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কাউন্সিল-আয়োজিত আলোচনাচক্রে পঠিত কয়েকটি বাংলা প্রবন্ধও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যেমন, মার্টিন রচিত 'আসীসীয়েরা ইয়ুরোপীয়েরদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে" (১৮০২); হান্টার রচিত "হিন্দুলোকেরা ভিন্ন ২ জাতি এই প্রযুক্ত তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির হানি হয়" (১৮০৩); টড্ রচিত "মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্যা প্রচার হয় এবং লোকেরদের নীতিজ্ঞতাচরণ দ্বারা উপকার হয়" (১৮০৪)।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য শিক্ষক ও সহযোগীদেরও পৃথক পৃথক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত পাঠ্যপুস্তকজাতীয় এই রচনাগুলি হল—

১. রামরাম বসু: 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২)।

২. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার: 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (রচনাকাল আনুমানিক ১৮১৩, মুদ্রণকাল ১৮৩৩) এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা' [১৮১৭, রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'-এর (১৮১৫) প্রতিবাদে লিখিত।]

৩. গোলোকনাথ শর্মা: 'হিতোপদেশ' (১৮০১)।

৪. তারিণীচরণ মিত্র: 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩), নীতিকথা (১৮১৮, সহকারী লেখক—রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন)

৫. **চণ্ডীচরণ মুনশী:** 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫)।

৬. **রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়:** 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫)।

৭. **রামকিশোর তর্কচূড়ামণি:** 'হিতোপদেশ' (১৮০৮)।

৮. **হরপ্রসাদ রায়:** 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫)।

৩. অভ্যুদয় পর্ব (১৮১৮-১৮৪৭)

বাংলা গদ্যের তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত হল ১৮১৮ সালে। এই সময় বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটল। এই যুগটিই বাংলা গদ্যের অভ্যুদয় পর্ব। ভাষাগত আদর্শের নিরিখে এই যুগ যদিও পূর্ববর্তী যুগকেই অনুসরণ করে চলেছে, ভাষাচিত্রে কোনো যুগান্তকারী পরিবর্তন সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি; তবুও এই যুগে মানসিকতার নব অভ্যুদয় ঘটে। ঘটে আত্মচেতনার নবজাগৃতি। জাতীয়-জীবন পুনরুজ্জীবনের অনিবার্য পরিণতিরূপে তাই এই সময়ের বাংলা গদ্যও হয়ে ওঠে পরিণত।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা ও উন্মেষপর্বে গদ্যরীতি ছিল পারিবারিক, বৈষয়িক বা বিশেষ প্রতিষ্ঠান-গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের বাহনমাত্র। কিন্তু অভ্যুদয় পর্বে এসে দেখা গেল, গদ্যরচয়িতার পাঠক কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন। ফলে, গদ্যসাহিত্য সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের চোরাকুঠুরী থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল নিত্য চলাচলের রাজপথে। এই পরিস্থিতিতেই উদ্ভূত হল বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা।

১৮১৮ পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের ওপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রভাব স্তিমিত হয়ে এল। ফলে, কেরী-পরবর্তী ইউরোপীয় বিদগ্ধজন যেমন, শ্রীরামপুরের ফেলিক্স্ কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, পীয়ার্স, ম্যাক্, ইয়েটস্, এলার্টন, স্টুয়ার্ট, হার্লি, মে, পীয়ার্সন প্রমুখ প্রায় যেন জনমানসের অন্তরালে চলে গেলেন। আর এই সহৃদয় বৈদেশিকদের পরিবর্তে এই যুগের নেতৃত্ব দিলেন কেরী, রামরাম বসু বা মৃত্যুঞ্জয়ের মতো কোনো প্রচারক নন; বরং সংস্কৃতিবান, সমাজসচেতন মধ্যবিত্ত জনগণের প্রতিভূস্বরূপ রামমোহন বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ যুগন্ধর পুরুষ।

এই যুগপ্রধানদের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছেন হিন্দু রক্ষণশীলরা; যেমন মৃত্যুঞ্জয়, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ; অথবা খ্রিস্টান পাদ্রিরা (মূলত শ্রীরামপুরের মিশনারীরা), তেমনি অন্যদিকে রয়েছেন রামমোহনপক্ষীয় যুক্তিনিষ্ঠ তার্কিত সংস্কারবাদীরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, হিন্দু কলেজের প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রমুখ। নব্যশিক্ষিত প্রধানদের মধ্যে ছিলেন ডেভিড হেয়ার এবং ডিরোজিও। এরা হয়ে উঠলেন 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর নায়ক। তাঁরা প্রায় সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এই সময়ে বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও

রাজনৈতিক চেতনার অভ্যুত্থানের পাশাপাশি দেখা দিল ইউরোপীয় নবজাগরণের ধারণালব্ধ নতুন আধুনিক ভাবধারা, স্বাধিকারচেতনা।

এই যুগেই আবির্ভূত হল বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র। ১৮১৮ থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্তত বাহাত্তরটি সংবাদ ও সাময়িকপত্র বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই পর্বের বিশেষ কয়েকটি পত্রিকা হল— 'দিগ্‌দর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮), 'সমাচারদর্পণ' (১৮১৮), গঙ্গাধর ভট্টাচার্য প্রকাশিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' বা Bengal Gazette, তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত 'সংবাদকৌমুদী' (১৮২১), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২), নীলরতন হালদারের 'বঙ্গদূত' (১৮২৯), ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা (১৮৪৩) ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্য ও গদ্যের প্রস্তুতি সংবাদপত্রকে আশ্রয় করেই অনেকাংশে বিস্তার লাভ করেছে। তাই অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় যাঁরা বাংলা গদ্যের ভিত গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁদের সম্মিলিত অনুপ্রেরণাতেই বাংলা গদ্য আভিধানিক অচলতা অথবা প্রাতিষ্ঠানিক সংকীর্ণতা ছিন্ন করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী রীতি বা ফারসিবহুল আদালতী রীতির দ্বিধা কাটিয়ে বাংলা ভাষা হয়ে উঠতে পেরেছিল সর্বজনের ব্যবহারযোগ্য। পরবর্তী যুগের 'আলালী' রীতি এবং বিদ্যাসাগরী রীতির পূর্বসূচনা হিসেবে তাই এই পর্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. বিকাশ পর্ব (১৮৪৭ খ্রি. - বর্তমান কাল)

বাংলা ভাষার চতুর্থ পর্বকে বলা যায় বাংলা গদ্যের 'বিকাশ পর্ব'। ১৮৪৭-এ বিদ্যাসাগরের 'বেতার পঞ্চবিংশতি'-র প্রকাশকাল থেকে যার সূত্রপাত। এই যুগে বাংলা গদ্যরীতিতে ঘটল আমূল পরিবর্তন। একে বলা যেতে পারে যুগান্তকারী বিপ্লব।

বিদ্যাসাগর বাঙালিকে শোনালেন বাংলা গদ্যের নিজস্ব ছন্দ, দেখালেন তার লালিত্য ও নমণীয়তা, নিয়ে এলেন যতিচিহ্নিত গদ্যে বাক্যগঠনরীতির সৌষম্য ও ছন্দস্রোত। পাশাপাশি অক্ষয়কুমার দত্তের নিপুণ লেখনীতে বাংলা গদ্যে প্রতিষ্ঠিত হল গদ্যরচনার দার্ঢ্য, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী তথ্যনিষ্ঠা ও বিষয়বৈচিত্র্য। আর, ১৮৬৫-তে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আত্মপ্রকাশে বাংলা গদ্য এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করল।

বাংলা গদ্যের অভ্যুদয় ও বিকাশ পর্ব রচিত হয়েছে বাঙালির জীবনের এক উদার বিস্তৃত পটভূমির অবসরে। বিভিন্ন সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, ধর্মীয় সংস্কারমুক্তি, রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও পাশ্চাত্য জীবনমহিমায় জাগ্রত জীবনচেতনাবোধ— এই সমস্ত মিলিয়েই রচিত হয়েছে এই যুগের চলমান চিত্র। এই যুগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—

১. রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব এবং তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫)।

২. ডিরোজিও-র আবির্ভাব (১৮০৯-১৮৩১) ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উদ্ভব (১৮৩১-৪৩)।

৩. পুস্তকপ্রকাশনার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রকাশনার ক্ষেত্রে মিশনারী প্রেস আর অপরিহার্য থাকল না। তাই সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বল্পমূল্যে পাঠ্যগ্রন্থ সরবরাহ করা ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭), 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) ইত্যাদি। পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত নানা মৌলিক রচনাও এই যুগে প্রকাশিত হতে থাকল।

৪. বাংলাদেশে কলেজশিক্ষার গোড়াপত্তন ঘটল এই যুগে। যেমন— হিন্দু কলেজ (১৮১৭), শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮), বিশপস্ কলেজ (১৮২০), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), কলকাতা মাদ্রাসা (১৮২৯), মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) ইত্যাদি।

৫. সাংস্কৃতিক সভাসমিতি ও বিদ্বৎসভার উদ্ভব ঘটল এই সময়েই। যেমন, রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩), হিন্দুমেলা (১৮৬৭) ইত্যাদি।

৬. বিচিত্র ধর্মীয় সভার উদ্ভব ঘটল এই সময়ে। যেমন, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মসভা স্থাপন (১৮২৯), রামমোহনের ব্রহ্ম উপাসনা সভা বা ব্রহ্মমন্দির স্থাপন (১৮২৮), ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (১৮৬৬), আর্যদ্বমাজ (১৮৭৫) এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রচারিত উদার হিন্দুধর্মের পাশাপাশি ওহাবী ফরাজী বা স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রবর্তিত মুসলিম সচেতনা (১৮৮৬-১৮৯৩)।

৭. সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ, যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ (১৮২৯), তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২), আইন-আদালতে ফারসির পরিবর্তে বাংলার প্রবর্তন (১৮৩৮), ১৮৫৬-য় বিধবা বিবাহ আইন পাশ, নীলবিদ্রোহ (১৮৫০-৬০), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)।

উন্মেষ পর্বের গদ্যরীতি:

উন্মেষ পর্বের ভাষাদর্শের প্রভাব বাংলা গদ্যের অভ্যুদয় পর্ব, এমনকি বিকাশ পর্বের রচনারীতিতেও প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় ছিল।

উইলিয়াম কেরীর আবির্ভাবকে উন্মেষ পর্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরলে দেখা যাবে, আঠারো শতকের শেষার্ধে প্রকৃতপক্ষে গদ্যরচনার দুটি রীতির আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথম রীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে মধ্যবাংলায়-অনুশীলিত ভাষারীতির সাধু শিষ্ট রূপ— যার সূত্রপাত বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বেই লক্ষ করা যায়। এই জাতীয় পরিশীলিত 'সাধু গৌড়ীয় ভাষা'র সার্থক প্রতিফলন ঘটল বোধহয় সর্বপ্রথম 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্যগল্পটিতে অথবা ডানকান-এর আইনগ্রন্থ অনুবাদের রচনাংশে (১৮৭৫)।

কাব্যে-ব্যবহৃত নব্য বাংলা থেকেই এই আধুনিক সাধু ভাষার ক্রমিক উত্তরণ ঘটেছে। এই দুটি রীতির পার্থক্য কেবল পদক্রম-বিন্যাসেই অঙ্গীকৃত। যেমন—

মধ্য বাংলা : 'প্রণাম করিয়া বীর চণ্ডীর চরণে। / শুভক্ষণে প্রবেশ করিল গিয়া বনে।।'

সাধু ভাষা : চণ্ডীর চরণে প্রণাম করিয়া বীর শুভক্ষণে বনে গিয়ে প্রবেশ করল।

অথবা

মধ্য বাংলা : 'তখন জানিল মনে ওঝা ধন্বন্তরি। / ঔষধ লইয়া গেল জয় বিষহরি।।'

সাধু ভাষা : ওঝা ধন্বন্তরি তখন মনে জানিল (যে) জয় বিষহরি ঔষধ লইয়া গেল।

অনেকক্ষেত্রে মধ্য বাংলার পদবিন্যাস সাধু ও শিষ্ট গদ্যে প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। যেমন—

মধ্য বাংলা : 'চান্দের আদেশ পায়্যা কাণ্ডারী চলিল।
সপ্তডিঙ্গা লৈয়া কালীদহে উত্তরিল।।...
মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ি বেটী কিসের দেবতা।।'

বাংলা গদ্যে দ্বিতীয় রীতির আবির্ভাব ঘটল সর্বপ্রথম আঠারো শতকের শেষার্ধে। এ রীতি হল বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপ আশ্রিত। এর আগে কাব্যসাহিত্যের অন্দরমহলে ভাষার শিষ্ট ও আঞ্চলিক ধর্মের প্রভাব ছিল। তাই মধ্য বাংলা আশ্রিত সাধু আদর্শের ওপর রাঢ়ী অথবা বরেন্দ্রী বা বঙ্গালী আবরণ মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। সেই সূত্র ধরেই রাঢ়ী আঞ্চলিকতার মৌখিক কথ্যধর্ম মাণিকরাম, বিপ্রদাস প্রমুখ লেখকদের রচনায় অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। তাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের অপিনিহিতি-অভিশ্রুতি-স্বরসংগতি-জনিত মৌখিক রাঢ়ী লক্ষণ ও তার নির্বিচার প্রয়োগ কাব্যে অমার্জনীয় 'গুরুচণ্ডালী' ত্রুটি হিসেবে গণ্য হত না। যেমন, অন্ত্যমধ্য বাংলা: লৈক্ষ্য < লক্ষ, সৈত্য < সত্য, জাত/রাত : জেতের/রেতের, হগু = হউক, দেখ্যা/ দেখে, কইর‍্যা/কর‍্যা/কোরে ইত্যাদি।

এমনকি রাঢ়ী বাংলাসুলভ শব্দের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ-রীতিও কাব্যের ভাষায় প্রতিফলিত হত। যেমন 'জল আন্তে যায়'। কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ সম্ভবত এই কথ্য ধর্মেরই প্রভাবজাত। কথ্যসর্বস্ব ধ্বন্যাত্মক দ্বৈত পদও কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই আরোপিত হত। যেমন—'ধাকাধোঁকা', 'লাথালোথা', 'ঢুঁসাঢুঁসি', 'আলাদুলা', 'ধুসেমুসে' ইত্যাদি। কথ্য ইডিয়ম প্রায় পুরোপুরি কথ্যরীতিতে বিন্যস্ত হত। যেমন— 'কেমনে যাইবি তোরা দুগ্ধের ছায়াল', 'সঘনে মুচড়ে দাড়ি গোঁপে দেয় তার'।/রঞ্জার বেটার মাথা খাব এইবার'। 'হাত পা ভাঙিয়ে রাখ বলে কয়ে তাকে।/ঠুটা খোড়া হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে', 'তোর পাকে আমার মরিল বেটা নাতি/একজন না রহিল কুলে দিতে বাতি', 'সময় কালেতে যাহা শিখাইলে গুরু/সেইসভ মন্ত্র যে আইসে সুড়ুসুড়ু' ইত্যাদি।

এই আঞ্চলিক ধর্ম কোথাও কোথাও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই অনেকক্ষেত্রে রাঢ়ী বৈভাষিক (Sub-dialectal) লক্ষণও সাহিত্যে অবধারিত ছিল। যেমন, ব্যঞ্জনবর্ণের মহাপ্রাণহীনতা (লাফ > লাপ, লাখ > লাক, বলিছে > বলিচে), 'ল্' স্থানে 'ন্' (লুকাইয়া > নুকায়ে, লুচি > নুচি, লৌকিকতা > নৌকতা), স্বরবিপর্যয় (মুকুট > মটুক), অতীতকালের উত্তমপুরুষের বিভক্তি '-লাম', '-লেম'-এর পরিবর্তে '-লুম', '-নু' (আলুম, আইলুম, আনু) ইত্যাদি।

অর্থাৎ, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এই রাঢ়ীয় আঞ্চলিকতা যতটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, গদ্যের ক্ষেত্রে তা ততটা হয়নি। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব অংশের উপভাষার স্থায়ী প্রভাব বাংলা সাধু গদ্যে দেখা দিয়েছে প্রকৃতপক্ষে গদ্যের বিকাশ পর্বে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। গদ্যে সংস্কৃতানুগত্য ও ফারসি প্রভাবের অতিরেক এই রাঢ়ী কথ্য আদর্শের তাড়নায় মধ্যপথ অবলম্বন করেছে।

কথ্য রাঢ়ী ভাষার, রামরাম বসুর কথায় 'এদেশীয় চলন ভাষা'-র সাহিত্যিক প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে উনিশ শতকের প্রারম্ভে, বাংলা গদ্যের 'কেরী' যুগে। রামরাম নিজেই তাঁর 'লিপিমালা' (১৮০২)-র ভূমিকায় এই কথ্য ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছেন, 'এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলনভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।

লক্ষণীয়, রামরামের কাছে এই কথ্যরীতি এদেশীয় বিদেশীদের শিক্ষা সহায়তার মাধ্যমরূপেই গৃহীত হয়েছে, সাহিত্যিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। তাই এই পর্বে সাধু ও কথ্যরীতি যেন দুটি সমান্তরাল ভিন্নধর্মী ভাষাপ্রবাহ। এই পর্বের লেখকরা তাই এই দুই রীতির সমন্বয়সাধন করতে পারেননি।

উনিশ শতকের গোড়ায়, কেরী-যুগে বাংলা গদ্যে আর একটি নতুন রচনাশৈলীর সংযোজন ঘটল, বাংলা গদ্যে পণ্ডিতী রীতি আরোপিত হল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হলেন এর প্রধান পথিকৃৎ। এই রীতির মুখ্য অবলম্বন সংস্কৃত অআদর্শ। 'আদর্শ' বলতে কেবল তৎসম শব্দচয়ন বা আভিধানিক উপাদান সংগ্রহ নয়; বাক্যরীতির অনুকরণও বটে। তাই সংস্কৃতসুলভ সমাসবাহুল্য, ব্যাকরণগত প্রক্ষেপ অথবা জটিল বাক্য প্রয়োগ বাংলা গদ্যে দেখা দিল। বিদ্যাসাগরের রচনার প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণগুলোর পাঠ তুলনা করলেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু বিকাশ পর্বে গদ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সংস্কৃত বাক্যরীতির পরিবর্জনে। এই পর্বেই সংস্কৃত বাক্যরীতির বলয় গ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে বাংলা গদ্য।

কাজেই, উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা গদ্যরীতির ক্ষেত্রে উপাদানগত বিভেদ ছিল মূলত তিনটি— এক. তদ্ভব শব্দ ও মৌখিক ইডিয়ম্-আশ্রিত আঞ্চলিক রীতি। যেমন, রাঢ়ী বা পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক রীতি। দুই. ফারসি শব্দ-প্রভাবিত রীতি। তিন. তৎসম শব্দ ও বাক্যরীতি আশ্রিত পণ্ডিতী রীতি।

৪ আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অনেকে মনে করেন, গদ্যের জন্ম আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাঙালির মৌখিক গদ্যের ব্যবহার আগেই প্রচলিত ছিল— দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে বাঙালি-যে আধুনিক যুগের আগে পদ্যে কথা বলত, এমনটা নয়। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে-গদ্য বাঙালির দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, সাহিত্যে তার প্রয়োগ সূচিত হল অর্থাৎ গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল আধুনিক যুগে।

২. সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্যেরও আবার দুটি রীতি গড়ে উঠল—সাধু ও চলিত ভাষা। মূলত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের (হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, উঃ ২৪ পরগণা ইত্যাদি) কথ্যভাষার ওপর ভিত্তি করে চলিত গদ্যের রূপ গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে মূলত মধ্যযুগীয় বাংলার শব্দরূপ-ধাতুরূপ ও প্রধানত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার নিয়ে সাধু গদ্য গড়ে তোলা হয়েছিল। যদিও সাধু ও চলিত গদ্যের ধারা উনিশ শতকে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছিল; তবু সেইসময় সাধু গদ্যের ধারাটিই বেশি বলবৎ ছিল। পরে ক্রমে চলিত গদ্যের ধারাটি বিকাশ লাভ করে এবং সাধু গদ্যের ব্যবহার কমে আসে।

৩. সাধুভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণতর দীর্ঘরূপ বজায় ছিল। যেমন, 'করিয়া', 'করিয়াছিল', 'যাহার', 'তাহার', 'হইতে' ইত্যাদি। চলিত ভাষায় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত হল। যেমন— 'করে', 'করেছিল', 'যার', 'তার', 'থেকে', 'হতে' ইত্যাদি।

৪. মধ্যযুগের বাংলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের ফলে শব্দ-মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হত (যেমন করিয়া > কইর‍্যা)। কিন্তু আধুনিক যুগের আদর্শ চলিত বাংলায় অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপের ধ্বনি-পরিবর্তন অভিশ্রুতি সংঘটিত হল (যেমনু কইর‍্যা > করে)।

৫. আধুনিক চলিত বাংলায় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বিষম স্বরধ্বনি স্বরসঙ্গতির প্রক্রিয়ায় সমীভূত হয়ে একইরকম বা প্রায় একইরকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন, দেশি > দিশি, পটুয়া > পোটো ইত্যাদি।

৬. মূল ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে '-অনট্' (অন), 'অ' ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে প্রথমে ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদ রচনা করা হয়। যেমন— গম্ + অনট্ (অন) = গমন, গৈ + অনট্ (অন) = গান, গ্রহ্ + অনট্ (অন) = গ্রহণ, √জ্ঞা + সন্ + অ + আ = জিজ্ঞাসা ইত্যাদি। এরপর তাকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে √কৃ-ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করে নানা যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন— গমন করা, গান করা, গ্রহণ করা, জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি। এইরকমের যৌগিক ক্রিয়াপদ

প্রথমে সাধুভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। পরে কিছু কিছু যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলিত ভাষাতেও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

৭. আধুনিক বাংলায় দু'টি সংযোজক অব্যয়— 'ও', 'এবং'-এর ব্যবহার খুব বেশি। এই দুটির মধ্যে 'এবং' আগে থেকেই প্রচলিত। 'ও' হল আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, এটি ফারসি 'ব' (wa) থেকে এসেছে।

৮. আধুনিক বাংলা ভাষার বাক্যগঠনরীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নাই', 'নি' ইত্যাদি, অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ারও আগে বসে। যেমন— ছেলেটা না মন দিয়ে পড়াশুনো করল, না মন দিয়ে অভিনয় করল।

৯. একাধিক সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহারে যৌগিক বাক্য গঠন না করে আধুনিক বাংলায় অনেকক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করে একটিমাত্র সরল বাক্যে পরিণত করা হল। যেমন— ছেলেটা বাড়ি গিয়ে (গেল এবং) ভাত খেয়ে (খেল এবং) পড়তে বসল।

১০. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিভিন্ন ভাষা থেকে নানান বিদেশি বা দিশি শব্দ প্রবিষ্ট হল। ইংরিজির পাশাপাশি পর্তুগীজ, ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান— ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটল।

১১. ছন্দোরীতিতে নানা বৈচিত্র্য আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুরোনো পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ও গৈরিশ ছন্দের জন্ম তো হলই; আধুনিক বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দেরও সূচনা হল। এছাড়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারও দেখা দিল।

৫ সারাংশ

সুবিস্তৃত আধুনিক যুগের কালপর্বের এই এককে উদাহরণযোগে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোচনা করা হল।

৬. অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষাকে কীভাবে কালগত দিক থেকে বিভক্ত করা যায়?

২. আধুনিক যুগের বাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি কী?

৩. সাহিত্যিক গদ্যের দুটি রীতির নাম কী?

৪. মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত অপিনিহিতি আধুনিক যুগের বাংলায় এসে কোন্ ধ্বনি পরিবর্তনকে সূচিত করে তুলেছিল?

৫. ধাতু, প্রত্যয় ও ক্রিয়া বিভক্তিযোগে একটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ দিন।

৬. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি কী?

৭. গদ্যছন্দের সূচনাকাল হিসেবে কোন্ সময়টিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার দুটি করে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

২. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি বুঝিয়ে দিন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. উদাহরণযোগে আধুনিক যুগের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২. প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির তুলনামূলক পরিচয় পরিস্ফুট করুন।

মডিউল : ৪

বাংলা উপভাষা, বাংলা উপভাষার পরিচয় (ক), বাংলা উপভাষার পরিচয় (খ), বাংলা উপভাষার পরিচয় (গ), সাধু ও চলিত ভাষা, বাংলা শব্দভাণ্ডার

একক ১২ ❑ বাংলা উপভাষা

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ উপভাষা কাকে বলে?

১২.৪ ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য

১২.৫ উপভাষার বিবিধ অঞ্চল

১২.৬ সামাজিক উপভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষা

১২.৭ বাংলা উপভাষা

১২.৮ সারাংশ

১২.৯ অনুশীলনী

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা ভাষা ও উপভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে। ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য, বিভিন্ন অঞ্চলভেদে উপভাষার বিভাজন, সামাজিক এবং আঞ্চলিক উপভাষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

১২.২ প্রস্তাবনা

ভাষা ও উপভাষা পৃথক হলেও কেন সেই পার্থক্যটি আপেক্ষিক, কোন্ কোন্ মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি অঞ্চলভেদে উপভাষা আলাদা হয়ে যায়, সামাজিক উপভাষার বিবিধ মাত্রাগুলি কী কী এবং জেলা-ভিত্তিক বাংলা উপভাষার বিভাজন— মূলত এই বিষয়গুলির ভিত্তিতেই বর্তমান এককটি গড়ে উঠেছে।

১২.৩ উপভাষা কাকে বলে?

ভাষা হল কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপ যার মাধ্যমে একটি বিশেষ সমাজের মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে।

যে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে এইভাবে ভাব বিনিময় করে, ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা-সম্প্রদায় বা speech community বলেন। Leonard Bloomfield

তাঁর 'Language' গ্রন্থে লিখছেন— 'A group of people who use the same system of speech signals is a **speech community**.'

ধরা যাক একটি ধ্বনিসমষ্টির কথা— 'আমরা বই পড়ি'। এখানে যে নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হল, সেই ধ্বনিসমষ্টি এই নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত করে শুধু বাঙালিরাই ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে যে-ভাব প্রকাশিত হয়, তা শুধু বাঙালিরাই বুঝতে পারে। সুতরাং বাঙালিদের একটি ভাষা-সম্প্রদায় বা 'speech community' বলা যায়। এই একই ভাব প্রকাশের জন্যে ইংরেজরা অন্য ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে বলবেন, 'We read book'। জার্মানরা বলবেন 'Wir lesen Bücher'। ফরাসিরা বলবেন 'Nous lisons des livres'।

অর্থাৎ, একইধরনের ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে সব মানুষের ভাবপ্রকাশ সম্ভব নয়। এক-এক ধরনের ধ্বনিসমষ্টি ও ধ্বনিসমাবেশ-বিধিতে এক-একটি জনগোষ্ঠী অভ্যস্ত। এক-একটি ভাষা আসলে এক-একটি জনসমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম। এক-একটি বিশিষ্ট ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপের ব্যবহারকারী জনসমষ্টিই হল এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায়।

কিন্তু এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায় যে-ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন, পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি পুরোপুরি একরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য, একেই বলে উপভাষা।

উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'A Dictionary of linguistics'গ্রন্থে (Pei, Merio A. and Gaynor, Frank) বলা হয়েছে, 'A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language.'

অর্থাৎ, উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন এক-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা বা standard language বা সাহিত্যিক ভাষা বা literary language-এর ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে, ওইসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে; অথচ পার্থক্যটা সেই পরিমাণেও বেশি হবে না যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে ওঠে।

১২.৪ ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য

ভাষা ও উপভাষার পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়— আপেক্ষিক। তা শ্রেণিগত নয়—মাত্রাগত। একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। কিন্তু এই আঞ্চলিক পার্থক্য বেড়ে চরমে পৌঁছলেই একই ভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক রূপগুলোকে তখন আর একই ভাষার উপভাষারূপে চিহ্নিতকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সেগুলিই এক-একটি স্বতন্ত্র ভাষার জন্ম দেয়।

যেমন, বাংলা ও অসমিয়া ভাষা প্রথমে একই ভাষার দুটি উপভাষা ছিল। পরে ক্রমে বঙ্গদেশ ও আসামের ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছল, তখন বাংলা ও আসামের ভাষার আঞ্চলিক রূপদুটিকে পৃথক ভাষারূপে চিহ্নিত করা হল— বাংলা ভাষা ও অসমিয়া ভাষা।

এখানে যে-প্রশ্নটির মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হয়, সেটি হল এই যে, একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক রূপের পার্থক্যকে কোন্ স্তর পর্যন্ত উপভাষার সীমানায় রাখা যাবে; আর সেই পার্থক্য বাড়তে বাড়তে কোন্ স্তরে উপনীত হলে সেগুলিকে আর উপভাষা বলা যাবে না, সেগুলি এক স্বতন্ত্র ভাষার জন্ম দেবে— এর সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডটি ঠিক কী?

বস্তুত, এই বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।

কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, ভাষার আঞ্চলিক রূপ যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠবে, তখন সেগুলিকে আর উপভাষা না বলে ভাষার মর্যাদা দেওয়া উচিত। যেমন— বাংলা ও আসামের ভাষা। কিন্তু এই মানদণ্ড অনুসরণ করলে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার উপভাষাকে দুটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দিতে হয়। অথচ পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলার ভাষাকে তো আমরা স্বতন্ত্র ভাষা বলি না— একই ভাষার দু'টি উপভাষা বলি। তাহলে বলা উচিত, দুটি জনগোষ্ঠী যখন সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক হবে, তখন তাদের আঞ্চলিক ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পাবে। যেমন— আসাম ও বাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক; কিন্তু পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক নয়। তাদের একটিই সংস্কৃতি এবং সেটি হল বাঙালি সংস্কৃতি।

এখানে মনে রাখতে হবে, সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ব্যাপারটাও অনেকাংশেই আপেক্ষিক। কারণ, বাংলা ও আসামের সংস্কৃতির মধ্যেও কিছুটা ঐক্যসূত্র আছে; অন্যদিকে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিতেও কিছুটা পার্থক্য আছে। কাজেই বলা যেতে পারে, ভাষা ও উপভাষার পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়— আপেক্ষিকমাত্র।

এই আপেক্ষিকতার ভিত্তিতেই বলা চলে যে, একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা থাকে, ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলোকে বলা হবে উপভাষা বা dialect। আর যখন এই আঞ্চলিক রূপগুলোই পৃথক হতে হতে পারস্পরিক বোধগম্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন তাদের স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায়।

কিন্তু এই মানদণ্ডও যে সর্বত্র প্রযোজ্য, একথা বলা যায় না। বাংলা ভাষারই দুটি উপভাষা, ধরা যাক—কলকাতা জেলার ভাষা এবং চট্টগ্রামের ভাষার মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা প্রায় নেই বললেই চলে। চট্টগ্রামের বাঙালি দ্রুত কথা বলে গেলে পশ্চিম বাংলার বাঙালি কিছুই বুঝতে পারবে না।

সেদিক থেকে আবার আদর্শ বাংলা ও আদর্শ অসমিয়ার মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা বেশি। অসমিয়া ও বাংলা দুটি পৃথক ভাষা। কিন্তু রাঢ়ী ও চট্টগ্রামী—একই ভাষার দুটি উপভাষা।

সাধারণত দেখা যায়, ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত। কিন্তু উপভাষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত।

ভাষার একটি সর্বজনীন আদর্শরূপ থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজের-নিজের অঞ্চলে ঘরোয়া কথায় বা informal discourse-এ আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু সাহিত্যে, শিক্ষায়, আইন-আদালতে, বক্তৃতায়, বেতার-সংবাদপত্রে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করে।

সেকারণেই দেখা যায়, একটি আদর্শ ভাষা বা standard language-এর এলাকার মধ্যে একাধিক উপভাষা প্রচলিত। উপভাষায় সাধারণত লোকসাহিত্য রচিত হয়। শিষ্টসাহিত্য রচিত হয় আদর্শ বা মান্য ভাষাতেই। তবে শিষ্টসাহিত্যে যদি উপভাষার ব্যবহার ঘটে থাকে, তবে তা নিশ্চিতভাবেই আঞ্চলিক লোকজীবনকে, লোকসমাজকে জীবন্তরূপে প্রতিভাত করার লক্ষ্যেই লেখক ব্যবহার করে থাকেন।

১২.৫ উপভাষার বিবিধ অঞ্চল

১) কেন্দ্রীয় অঞ্চল : উপভাষা নিরীক্ষার সময় দেখা যায় যে, একটা অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত থাকলেও সব অঞ্চলের উপভাষার সামাজিক বা সাংস্কৃতিক মর্যাদা সমশ্রেণির নয়। একটি অঞ্চলের উপভাষার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অন্যান্য অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, একটি অঞ্চলের উপভাষা যখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে, তখন যেখান থেকেই সেই পরিবর্তন শুরু হয়, সেই অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় অঞ্চল বা Focal area হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উপভাষার মানচিত্রে রেখার সাহায্যে এই অঞ্চল নির্দেশিত হয়ে থাকে।

২) পুরানিদর্শন অঞ্চল : পুরানিদর্শন অঞ্চল উপভাষার সেই অঞ্চলকে বলা হয়, যে-অঞ্চলের উপভাষাগত মর্যাদার অভাবের জন্যে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ যদি কোনো 'উপভাষাভাষীয় অঞ্চল' উপভাষার মর্যাদার অভাবের কারণে অন্যান্য উপভাষী অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে এবং সেই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের কারণে সেই অঞ্চলে উপভাষার প্রাচীন রূপ সংরক্ষিত থাকে অথবা কোনো ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান সেই অঞ্চলের সর্বত্র সমানভাবে বিস্তার লাভে অক্ষম হয়, তখন সেই অঞ্চলকে পুরানিদর্শন অঞ্চল বা Relic area বলে। অনেক সময় এই অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ ও সংরক্ষণশীল ভাষাভাষী কর্তৃক প্রাচীন উচ্চারণ সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে।

৩) সমরূপমূলীয় অঞ্চল : উপভাষার মানচিত্রে বিভিন্ন উপভাষীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নির্দেশের জন্যে একটি অঞ্চলের থেকে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য দেখানো হয়। এই পার্থক্য নির্দেশ করার সময় একই ধরনের রূপমূল প্রচলিত আছে— সেই সমস্ত অঞ্চলকে একটি বৃত্ত দিয়ে বেষ্টন করা হয়। সেই অঞ্চলটিকেই বলা হয় সমরূপমূলীয় অঞ্চল।

৪) সমক্রমবিন্যাস অঞ্চল : উপভাষা বিশ্লেষণকারী একটি উপভাষীয় অঞ্চলে কোনো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে কিনা, তা পর্যালোচনা করে থাকেন। কোনো উপভাষা অঞ্চলের সমরূপমূলীয় রেখা-সহ সেই অঞ্চলের সংস্কৃতি, লোকগাথা, আধিভৌতিক বিশ্বাস, কৃষিজীবীর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় চিহ্নিত হয়। উপভাষাবিদরা তাঁদের নিরীক্ষার ফলাফল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে সমশ্রেণির আপেক্ষিকতার সাহায্যে বিন্দুগুলো সংযুক্ত করেন। রেখার সাহায্যে নির্দেশিত সহনিমিত্তই সমক্রমবিন্যাস নামে পরিচিত। অর্থাৎ সমক্রমবিন্যাস হল সংস্কৃতির বিভিন্ন মাত্রার নিরিখে চতুর্দিক বেষ্টনকারী একটি রেখাঙ্কিত অঞ্চল— যেখানে ভাষার ওপর সমশ্রেণির আরোপিত প্রভাব বিদ্যমান।

৫) সন্ধি অঞ্চল : অনেকসময় পূর্ণ সংজ্ঞাকৃত উপভাষা অঞ্চল থাকলেও পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা তার বেশি উপভাষীয় অঞ্চলের উপভাষাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণির উপভাষীয় অঞ্চলকে সন্ধি অঞ্চল বা Transition Area হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি সীমান্তবর্তী মীরেশ্বরাই অঞ্চলকে সন্ধি অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ, এই অঞ্চল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় উভয় অঞ্চলের ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

৬) সংমিশ্রণ : অনেক সময় দুটি উপভাষীয় অঞ্চলে একই বস্তু নির্দেশক প্রচলিত দুটি রূপমূল একত্রিত হয়ে নতুন একটি রূপমূল গঠন করে, তখন তাকে সংমিশ্রণ বা blend বলা হয়। যেমন, ধরা যাক 'পটল' শব্দ। এর রূপমূলের অর্থবাচক রূপমূল 'ক' অঞ্চলে 'মাটা' রূপে এবং 'খ' অঞ্চলে 'আলসা' রূপে প্রচলিত। 'মাটা' ও 'আলসা'—এই দুটি স্বাধীন রূপমূল একত্রিত হয়ে 'আসাটা' রূপমূল গঠন করলে তাকে সংমিশ্রণরূপে চিহ্নিত করা যায়। পশ্চিম জার্মানীতে 'আলু' নির্দেশক ভিন্নতর দুটি রূপমূল 'Erdapfel' ও 'Grandbirne' একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছে— 'Erdbirne'।

১২.৬ সামাজিক উপভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষা

সামাজিক স্তরভেদে একই ভাষাভাষী লোকেদের কথোপকথনে পার্থক্য ঘটে থাকে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, একজন অধ্যাপক, একজন উকিল, একজন রাজনৈতিক নেতা, একজন শ্রমজীবী বা একজন দাগি অপরাধীর ভাষাব্যবহারে পার্থক্য থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই সামাজিক উপভাষার বিভিন্ন মাত্রা। যেমন— শ্রেণিগত, পেশাগত, লিঙ্গগত ইত্যাদি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নিষিদ্ধ জগতের ভাষাও।

শ্রেণিগত ভাষা : শ্রেণিভেদে বিভিন্ন মানুষের ভাষায় পার্থক্য ঘটে। যেমন, 'মহিলা', 'নারী', 'রমণী'—

এই তিনটি শব্দের অর্থ একই হলেও সামাজিক শ্রেণিগত স্তর অনুসারে এগুলির ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষণীয়। এই শ্রেণির রূপমূল ব্যবহারে উপভাষা ও চলিত ভাষাভাষীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। চলিত ভাষায় 'মহিলা', 'নারী', 'রমণী'-র পরিবর্তে উপভাষা অঞ্চলবিশেষে 'বেটি', 'মাগী', 'ছেড়ি', 'মেয়ে' এমনকি কখনও কখনও 'মেয়েছেলে'-ও ব্যবহৃত হয়। 'ছেড়ি'-র মার্জিত রূপমূল 'ছুঁড়ি' চলিত ভাষায় অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বা অবজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহৃত।

বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের ভাষা ব্যবহারে বিভিন্ন আদবকায়দার প্রতিফলন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শ্রেণিগত ভাষার মধ্যেও তাই অনেক রূপান্তর ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উচ্চবিত্ত পরিবারের একজন তরুণ সদস্য নামী স্কুলে অধ্যয়ন করলে অনেকসময় তার মধ্যে স্বতন্ত্র বিশেষার্থক শব্দ গড়ে উঠতে পারে—যা অন্য শ্রেণির মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। বস্তিবাসী কোনো ছেলে বা মেয়ের পক্ষে সেই ভাষা ব্যবহার প্রায় অসম্ভব।

পেশাগত ভাষা : পেশাগত কারণেও ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। পেশাগত ভাষায় বৈষম্যের ক্ষেত্রে মানুষের নিজস্ব শিক্ষা, রুচি ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একজন অধ্যাপক শ্রেণিকক্ষে যে-ভাষায় শিক্ষাদান করেন, একজন শ্রমিক বা মজুর যে-ভাষায় তাঁদের দাবি-দাওয়া জানান, শ্লোগান দেন— দুটিই বাংলা ভাষা হলেও, ভাষাপ্রয়োগের পার্থক্যটি আমাদের চিহ্নিত করতে অসুবিধে হয় না।

লিঙ্গগত বিভাজন : নারী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করে সামাজিক বিভাজন করা হয়ে থাকে। এই পার্থক্যের কারণ হল উভয়ের জীবনাচরণ ও সামাজিক জীবনপ্রণালী এক নয়। কোনো কোনো জাতির সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের জন্য নারী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে পুরুষরা নিয়োজিত থাকতেন শিকারে। নারীদের কৃষিক্ষেত্রে দেখা যেত। ফলে উভয়শ্রেণীর কথোপকথনের ক্ষেত্রে বিষয়গত পার্থক্য সুস্পষ্ট। এমন এক সময় ছিল যখন নারীদের পক্ষে বিশেষ কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল। যেমন, হিন্দু সমাজে নারীরা একসময় শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী বা গুরুজনদের নামোচ্চারণ না করে অন্য শব্দের প্রয়োগে তা বুঝিয়ে দিতেন। নারীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় সাঙ্কেতিক ভাষাও ব্যবহার করেন। তবে নারী ও পুরুষ—উভয়ের ভাষার ব্যবহারেই নিষিদ্ধ যৌন শব্দের পৃথক প্রয়োগ প্রচলিত।

অঞ্চল-ভেদে বিভক্ত উপভাষাই হল আঞ্চলিক উপভাষা। এই আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাষার Attic-Ionic, Arcadian-Cyprian, Aeolic, Doric প্রভৃতি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল। হোমারের মহাকাব্যেও Ionic ও Aeolic উপভাষার পরিচয় আছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। তখনকার তিনটি প্রধান উপভাষা ছিল— উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত 'উদীচ্য', মধ্য ভারতে 'মধ্যদেশীয়' এবং পূর্ব ভারতে 'প্রাচ্য'। সম্ভবত

'দাক্ষিণাত্য' নামে আরো একটি উপভাষা ছিল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষাতেও চারটি প্রধান উপভাষা ছিল—উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা এবং প্রাচ্যা। পৃথিবীর আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যেও আঞ্চলিক রূপভেদের প্রমাণ অসংখ্য। আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীর দুই প্রধানরূপ— ব্রিটিশ ও আমেরিকান। ব্রিটিশ ইংরেজীও সর্বত্র সমান নয়। উত্তর ও দক্ষিণের বিভাজনে সেখানেও দুটি রূপভেদ— Northern English ও Southern English।

অপভাষা : সমাজের ইতরশ্রেণি ও অপরাধীদের মধ্যে গোপন সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতপূর্ণ যে-ভাষা প্রচলিত থাকে, তাকে অপভাষা বা সঙ্কেতভাষা বলে। যেমন—মাল খাওয়া (মদ্য পান), খোকা (বন্দুক) ইত্যাদি।

১২.৭ বাংলা উপভাষা

আমরা সকলেই সাধারণভাবে জানি, বাংলা উপভাষা অঞ্চলভেদে পাঁচ প্রকার— রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। তবে মহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাভাষার উপভাষাগুলিকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করেছেন— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। এই বর্গীকরণ যদিও রাষ্ট্রিক নয়, ভৌগোলিক। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ— এই রাজনৈতিক বিভাজনের পরিবর্তে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক সীমানাই এখানের মানদণ্ড। শহীদুল্লাহ প্রাচ্য উপভাষাগুলিকে কিছুটা নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন। একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে সেটি দেখানো হল।

১২.৮ সারাংশ

ভাষার সাহায্যে মানুষ ভাববিনিময় করে। আর, উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত। অর্থাৎ একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। উপভাষার বিবিধ আঞ্চলিক মাত্রা আছে। যেমন, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, পুরানিদর্শন অঞ্চল, সমরূপমূলীয় অঞ্চল, সমক্রমবিন্যাস, সন্ধি অঞ্চল, সংমিশ্রণ। সামাজিক উপভাষার বিবিধ মাত্রা— শ্রেণিগত, পেশাগত, লিঙ্গগত ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে অপভাষা বা সঙ্কেত ভাষা। ভৌগোলিক ভিত্তিতে বাংলা উপভাষার বিভাজনটি বোঝার জন্য অন্তিম বৃক্ষচিত্রটি দ্রষ্টব্য।

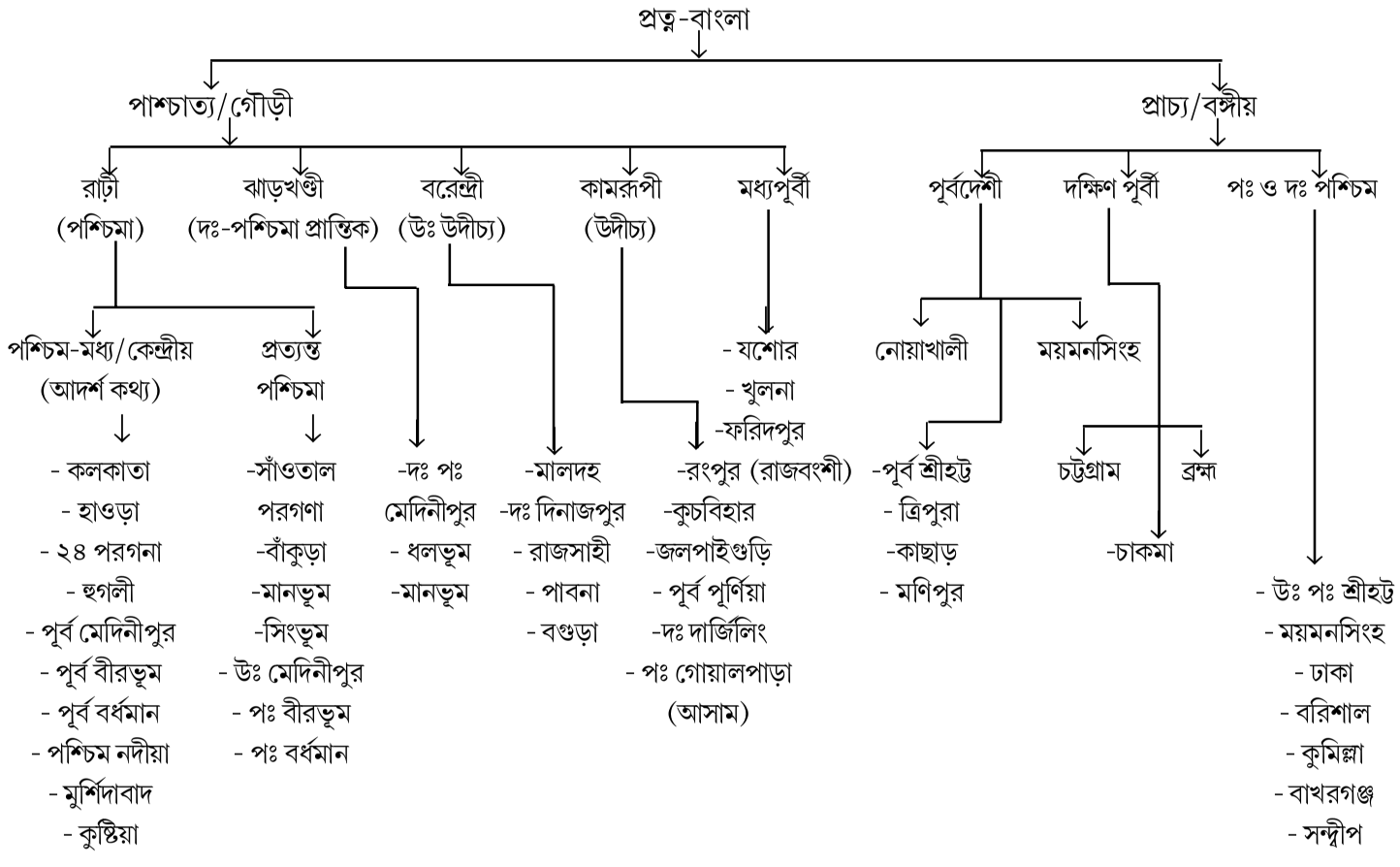

বাংলা ভাষার উপভাষা-চিত্র

১২.৯ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. ভাষা কাকে বলে?

২. উপভাষা কাকে বলে?

৩. অপভাষার দুটি উদাহরণ দিন।

৪. বাংলা ভাষার কোন্ উপভাষাটি কলকাতায় প্রচলিত?

৫. ভাষা-সম্প্রদায় কাকে বলে?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. টীকা লিখুন : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, অপভাষা।

২. উপভাষার সন্ধি অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. পেশাগত দিক থেকে সামাজিক উপভাষার ভিন্নতা কীভাবে লক্ষ করা যায়?

৪. আঞ্চলিক উপভাষা কী?

৫. মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় কটি উপভাষা ছিল? সেগুলি কী কী?

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ভাষা-উপভাষার পার্থক্যটি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

২. উপভাষার বিবিধ অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. সামাজিক উপভাষা কাকে বলে? সামাজিক উপভাষার মাত্রাগুলি কী কী? সেগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

একক ১৩ ❑ বাংলা উপভাষার পরিচয় (ক)

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ রাঢ়ী উপভাষা

ক) রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৩.৪ ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

ক) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৩.৫ অনুশীলনী

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার দুটি উপভাষা—রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে। দুটি উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারবে।

১৩.২ প্রস্তাবনা

ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক দিক থেকে রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষাদুটি আলোচিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ওই দুটি উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি জানার পাশাপাশি উপভাষা দুটির ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য করতেও সমর্থ হবে।

১৩.৩ রাঢ়ী উপভাষা

(ক) রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. ‘অ’ ধ্বনির ‘ও’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন— অতুল > ওতুল, সতী > সোতী, কথ্য > কোত্থ্যো, যক্ষ > যোক্‌খো, মন > মোন ইত্যাদি। ব্যতিক্রম— ‘জল’, কখনো ‘জোল’ উচ্চারণ হয় না।

২. ‘এ’ ধ্বনির ‘অ্যা’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন— এক > অ্যাক, কেন > ক্যান। তবে অনেকস্থানে ‘এ’ অবিকৃতরূপেই উচ্চারিত হয়। যেমন, ‘তেল’, ‘দেশ’ ইত্যাদি।

৩. ‘ই’ ও ‘উ’ যথাক্রমে ‘এ’ ও ‘ও’ রূপে অনেকক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়। যেমন— শিকল > শেকল, চিতল > চেতল, উঠা > ওঠা, কিনা > কেনা, লিখা > লেখা ইত্যাদি।

৪. প্রত্যন্ত পশ্চিমা রাঢ়ী উপভাষায় কখনো কখনো ‘ও’ উচ্চারিত হয় ‘উ’রূপে। যেমন— পুরনো > পুরুনো, কোন্‌টা > কুনটা ইত্যাদি।

৫. পদান্ত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ পায়। অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ যথাক্রমে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়। যেমন— গাছ > গাচ, মাথা > মাতা, গাধা > গাদা, ঝাঁঝ > ঝাঁজ, মধু > মদু, দুধ >দুদ ইত্যাদি।

৬. কখনো অঘোষ ধ্বনি, ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ঘোষীভবন ঘটে। তখন, বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ যথাক্রমে বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণে পরিণত হয়। যেমন— কাক > কাগ, ছাত > ছাদ, বক > বগ, চাটনি > চাডনি ইত্যাদি।

৭. অপিনিহিতি : ‘ই’-কার জনিত — করিয়া > কইর‍্যা

‘য’-ফলা জনিত — সত্য > সইত্য, কন্যা > কইন্যা

‘উ’-কার জনিত — জলুয়া > জউলয়া ইত্যাদি

৮. অভিশ্রুতি : ই-কার জনিত — আসিয়া > আইস্যা > এস্যা > এস্যে > এসে

‘য’-ফলা জনিত — কন্যা > কইন্ন্যা > কন্যা > কন্যে > কনে

‘ঋ’-কার জনিত — মাতৃকা > মাইয়া > মাইআ > মেয়া > মেয়ে

৯. নাসিক্যীভবন : যেমন— বন্ধ > বাঁধ, চন্দ্র > চাঁদ।

কখনো কখনো স্বতঃনাসিক্যীভবনও লক্ষ করা যায়। যেমন— হাসি > হাঁসি, হাসপাতাল > হাঁসপাতাল।

১০. ‘ল’ ও ‘ন’ ধ্বনির বিপর্যয় : যেমন— লাল > নাল, গুলো > গুনো, লুচি > নুচি, লোহা > নোয়া।

১১. শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের দ্বিমাত্রিকতা সৃষ্টি বা শব্দমধ্যগত স্বরবর্ণের লোপ। যেমন— কষটি > কষ্টি, গামোছা > গাম্‌ছা, রান্ধনা > রান্না। ব্যঞ্জনদ্বিত্ব-র উদাহরণ— সবাই > সব্বাই, বড় > বড্ড।

১২. পশ্চিমা রাঢ়ী উপভাষায় শব্দের আদিতে সুস্পষ্ট ঝোঁক বা stress-এর ফলে কখনো ‘হ’ ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন— আমার > হামার।

(খ) রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রূপতাত্ত্বিক :

১. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে '-দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন— কর্মকারকে : আমাদের বই দাও, করণকারকে : তোমাদের দ্বারা একাজ হবে না।

২. গৌণকর্মে '-কে' বিভক্তি যোগ। যেমন— বাবাকে বসতে বলো।

৩. অধিকরণ কারকে 'এ', 'তে' বিভক্তি যোগ। যেমন— আমি শালবনিতে থাকি, শ্যাম শ্যামনগরে যাবে।

৪. বহুবচনের প্রত্যয় অনুসর্গ যোগ : যেমন— 'গুলি', 'গুলো', 'গুনো' (গাছগুলি, কাজগুলো, কথাগুনো)। পশ্চিমা রাঢ়ীতে '-গুলাক', '-গুলান' ইত্যাদি যোগ। যেমন— ছেলেগুলান।

৫. করণকারকের অনুসর্গ 'সঙ্গে', বর্তমানে পূর্বী প্রভাবের ফলে 'সাথে' হয়ে গেছে। অপাদান কারকের অনুসর্গ 'থেকে'। বাজার থেকে সব্জি কিনে আন।

৬. বর্তমান কালের উত্তর পুরুষে ক্রিয়া বিভক্তি 'ই' যুক্ত হয়। যেমন—আমি করি, আমরা করি।

৭. সদ্য অতীতকালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তিতে '-লে' যোগ হয়। যেমন— রাম বললে। সদ্য অতীতকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি '-লুম' (আমি করলুম), মধ্যম পুরুষে 'লে' যোগ। (তোমরা চললে)।

৮. ভবিষ্যৎকালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি '-বে' (রাম করবে), পশ্চিমা রাঢ়ীতে '-ব্যা' (শ্যাম করব্যা), উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি '-ব' (আমি যাব) যোগ।

৯. মূল ধাতুর সঙ্গে √আছ্ যোগ করে তার সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন— √কর্ + ছি = করছি (আমি করছি), √কর্ + ছিল = করছিল (রাম কাজ করছিল)।

১০. মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সঙ্গে √আছ্ যোগ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে পুরাঘটিত অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমানের ক্রিয়ারূপ রচনা করা হয়। যেমন— করে + ছে = করেছে (রাম অঙ্ক করেছে), করে + ছিল = করেছিল (যদু কাজ করেছিল)।

অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

রাঢ়ী উপভাষায় নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন— রমা সেখানে যাবে না। তুমি যেও না— ইত্যাদি।

১৩.৪ ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

এই উপভাষার 'ঝাড়খণ্ডী' নামকরণ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন। কিন্তু সুধীর কুমার করণের মতে, এর নাম হওয়া উচিত 'সীমান্ত রাঢ়ী'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর নামকরণ করেছেন 'সুহ্মদেশীয়' বা 'সুহ্মক' বাংলা।

সুকুমার সেনের মতে, ঝাড়খণ্ডী অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষাগুচ্ছ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের কথ্যভাষা রাঢ়ীর অন্তর্ভুক্ত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম কথ্য ভাষাগুলিকে দণ্ডভুক্তীয় স্তবক বলা যায় এবং মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তের ধলভূম ও মানভূমের কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্ডী বলা যায়।

(ক) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পদান্ত '-ইআ' প্রায়শই 'এ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত। যেমন—করিয়া > কর্যা, কোর্যা।

২. দ্ব্যক্ষরী বা disyllabic শব্দে আদি 'ও', পদান্ত 'আ'-কারের প্রভাবে 'অ'-কারে পরিণত। যেমন, বোকা > বকা, রোগা > রগা।

৩. অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— দূর > ধূর।

৪. প্রায়শই 'র' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে এবং 'ন' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— নহে > লহে, নাতি > লাতি, নিব > লিব, নাতিপুতি > লাতিপুতি, লোকেরা > লক্‌লা।

৫. আনুনাসিকতার প্রাচুর্য লক্ষণীয়। যেমন— উঁট, হাঁতি, সাঁপ ইত্যাদি।

৬. অপিনিহিতজনিত পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। যেমন—রাতি > রাইত, কালি > কাইল।

৭. আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে পদমধ্য স্বরের লোপ ও ব্যঞ্জনদ্বিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন— লোকের > লোক্কার, দুইটা > দুট্টা, দাও > দও/দ্যাও, ভিতরে > ভিত্‌রে ইত্যাদি।

(খ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রূপতাত্ত্বিক :

১. কর্মকারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন— বাবাকে কইল, জলকে চল।

২. অপাদান কারকে '-লে' অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— ঘর লে (গৃহ থেকে)।

৩. সম্বন্ধপদ ও অধিকরণ কারকে শূন্যবিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। সম্বন্ধপদে — ঘাটশিলা (ঘাটশিলার) শাড়ি মুনি (মুনির) মনে নাই লাগে। আবার অধিকরণকারকে যেমন, রাইত (রাতে) ছিলি কন?

৪. অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হল '-নু', 'লে', 'রু' ইত্যাদি। যেমন— মায়ের লে মাউসীর দরদ (মায়ের চেয়ে মাসির দরদ)

৫. অধিকরণ কারকে কখনো '-কে' বিভক্তি লক্ষণীয়। যেমন— 'আজি রাইতকে ভারি জাড়াবে'।

৬. ক্রিয়াপদে 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— যাবেক লাই?

৭. অস্ত্যর্থক 'বঠ্' ধাতুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— তুমহার মিথা কথা বঠে, হামাদের ভাগে বাঁগলা বঠে।

৮. 'ল' যুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ এই উপভাষার অন্যতম রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। যেমন— ভুক্‌লা বাঘ।

৯. বহুবচন প্রত্যয় -মন্/-মেন্-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— তারমন্‌কের, তারমেন্‌কার (তাঁদের)

১০. নামধাতুর বাহুল্য। যেমন, পুকুরের জলটা গঁধাচ্ছে, মাথাটা দুখাছে, জলটা বাসছে (< বাস 'গন্ধ')।

১১. যৌগিক ণিজন্ত পদের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— উঠা করালো (= উঠাইলো), আনা করাবো (= আনাইবো)।

১২. উত্তমপুরুষের সর্বনাম মুই/আমি, বহুবচনে আমরা/হামরা; মুখ্য ও গৌণ কর্মে মো-/আমা- লক্ষণীয়।

অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন— কেনে নাই খাবা? (কেন খাবে না?)

১৩.৫ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. রাঢ়ী উপভাষায় পদান্ত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে— এমন একটি উদাহরণ দিন।

২. হাসপাতাল > হাঁসপাতাল— এটি রাঢ়ী উপভাষার কোন্ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য?

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় যৌগিক ণিজন্ত পদব্যবহারের একটি উদাহরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. রাঢ়ী উপভাষার পাঁচটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে উল্লেখ করুন।

২. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার পাঁচটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. সংক্ষেপে রাঢ়ী উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষার পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করুন।

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

একক ১৪ ❑ বাংলা উপভাষার পরিচয় (খ)

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ বরেন্দ্রী উপভাষা

ক) বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) বরেন্দ্রী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৪.৪ কামরূপী উপভাষা

ক) কামরূপী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) কামরূপী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৪.৫ অনুশীলনী

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার দুটি উপভাষা—বরেন্দ্রী ও কামরূপী উপভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে। দুটি উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারবে।

১৪.২ প্রস্তাবনা

ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক দিক থেকে বরেন্দ্রী ও কামরূপী উপভাষাদুটি আলোচিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ওই দুটি উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি জানার পাশাপাশি উপভাষা দুটির ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য করতেও সমর্থ হবে।

১৪.৩ বরেন্দ্রী উপভাষা

রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী মূলত একই উপভাষার অন্তর্গত ছিল। পরে একদিকে প্রাচ্য বা বঙ্গালী এবং অন্যদিকে বিহারীর প্রভাবে বরেন্দ্রী উপভাষা রাঢ়ী উপভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

(ক) বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. 'এ' স্বরধ্বনির 'অ্যা' হিসেবে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন, এক > অ্যাক, যেন > য্যান।

২. পদের গোড়ায় 'র'-কারের লোপ অথবা আগম। যেমন, আমের রস > রামের অস, রাস্তা > আস্তা ইত্যাদি।

৩. জ (j) প্রায়ই জ্ (z) রূপে উচ্চারিত। যেমন, জানতি পারো না > Zanti পারো না।

৪. 'শ', 'ষ', 'স'— সব ধ্বনিই 'শ' রূপে উচ্চারিত। যেমন, বিশয় (বিষয়), শম্পৎ (সম্পদ), শে (সে) ইত্যাদি।

৫. আনুনাসিকতা লক্ষণীয়। যেমন, তাঁই (তিনি), বাঁট্যা (বাঁটিয়া)

৬. চলিত ভাষায় ড়, ঢ় ধ্বনিদ্বয় রক্ষিত। যেমন, আড়ি, আঢ়েয়া।

৭. ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি পদান্তে অল্পপ্রাণিত। কিন্তু অন্যত্র বজায় আছে। এছাড়া আদি 'হ' ধ্বনি রক্ষিত। কিন্তু স্বরমধ্যগত 'হ' দুর্বল। যেমন, তাহাদের > তায়েদের, তাহাতে > তাহাৎ/তাৎ।

(খ) বরেন্দ্রী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. রাঢ়ীসুলভ কর্তৃকারক ব্যতীত অন্য কারকের বহুবচনে '-দের' প্রত্যয় যোগ। যেমন, তায়েদের, মদ্‌ধে।

২. বহুবচনের বিভক্তি 'গুলা', 'গিলা' ইত্যাদি যোগ। যেমন, কাজগুলা।

৩. অনেকসময় কর্মকারকে 'ক' বিভক্তি এবং অধিকরণকারকে 'ত' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন, হামাক দ্যান, ঘরৎ চল ইত্যাদি।

৪. অতীতকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি '-লাম' এবং ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি 'মু' বা 'ম' যুক্ত হয়। যেমন, অতীতকালে— হামি যাইলাম, ভবিষ্যতে— হামি খামু/খাম ইত্যাদি।

৫. অসমাপিকা 'ইয়া' প্রত্যয়ের স্থানে রাঢ়ীসুলভ '-এ'-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন, শুনিয়া যা > শুনে যা ইত্যাদি।

১৪.৪ কামরূপী উপভাষা

কামরূপী ও বরেন্দ্রীকে একত্রে উদীচ্য উপভাষা বলা যায়। কামরূপী উপভাষা বরেন্দ্রী ও বঙ্গালী উপভাষার মাঝামাঝি। কোনো কোনো বিষয়ে কামরূপী উত্তরবঙ্গের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পূর্ববঙ্গের উপভাষার কাছাকাছি। তবে বরেন্দ্রীর সঙ্গে কামরূপীর সাধর্ম্য-ই বেশি। কামরূপী উপভাষার পূর্বী আঞ্চলিক বিভেদ থেকেই অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ।

(ক) কামরূপী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. 'ও'-কারের 'উ' রূপে উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন, তোমার > তুমার, কোন > কুন ইত্যাদি। তবে, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি ব্যতিক্রমী।

২. আদি 'র' ধ্বনির বর্জন এবং স্বরবর্ণের সংরক্ষণ। যেমন—রাজা > আজা, রাতি > আতি, রাগ > আগ।

৩. 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' ধ্বনি যথাক্রমে 'ৎস', 'স', 'দজ', 'জ' তবে, গোয়ালপাড়া, রংপুরের উচ্চারণে চ-বর্গের মূল উচ্চারণ রক্ষিত। যেমন, 'বাচ্চা' প্রকৃতপক্ষে 'বাচ্চা' রূপেই উচ্চারিত হয়।

৪. 'ল' ধ্বনি প্রায়শই 'ন' ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত। যেমন, লাঙল > নাঙল, লাউ > নাউ, লাল > নাল ইত্যাদি।

৫. আবার কখনো বিষমীভবনের ফলে 'ন' ধ্বনিও 'ল' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন, জননী > জলনী, সিনান (স্নান) > সিলান ইত্যাদি।

৬. শ, স, ষ, ধ্বনি 'শ'-এ পরিণত হয়। যেমন, আষাঢ় মাসে জাতকে বলা হয় আশারু।

৭. 'ড়', 'ঢ়' ধ্বনি আসলে 'র' ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— বড় > বর, শাড়ি > শারি, আষাঢ় > আশার ইত্যাদি।

৮. স্বরের আনুনাসিকতা এই উপভাষায় রক্ষিত হয়েছে। যেমন— ইঁয়া (ইহা), কঁরো (করো) ইত্যাদি।

৯. শব্দের আদিতে 'অ' ধ্বনি প্রায়শই শ্বাসাঘাতের ফলে 'আ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত। যেমন— আসুখ (অসুখ), আনল (অনল), আতি (অতি), কাথা (কথা) ইত্যাদি।

(খ) কামরূপী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. তীর্যক কারকের বহুবচনে '-গুলা' যোগ। যেমন— গাছগুলা, আমার গুলার।

২. কর্মকারকে 'ক' বিভক্তি যোগ। যেমন— আমাকে ভুলালি > মোক্ ভুলালু, আমার খিদে পেয়েছে > মোক্ খিদান্ লাগিছে। অপাদানকারকে 'থাকি' অনুসর্গীয় বিভক্তি (যেমন— ঘর থাকি = ঘর থেকে), বা করণকারকে 'দিয়া' অনুসর্গীয় বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, ঘর দিয়া = ঘর দিয়ে।

৩. মধ্যমপুরুষের অতীত বা ভবিষ্যৎকালে 'উ' বিভক্তি (যথা, তুই করলু, তুই করবু ইত্যাদি), উত্তমপুরুষের ভবিষ্যৎকালে '-ম'/'মু' যোগ। যেমন, করিম (একবচন), করমু (বহুবচন)। কিন্তু অন্য পুরুষে 'ব' বা 'বে' বিভক্তি যোগ। যেমন, 'করবে'।

৪. অসমাপিকা '-ই' প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— করি (করিয়া), দেখি (দেখিয়া) ইত্যাদি।

৫. 'ল'-যুক্ত ভাববচন। যেমন, আসিবার সময় > আসিল্ কালে।

৬. '-ল'/-ব যুক্ত কৃদন্ত বিশেষণ : দেখিলা মান্‌ষি (=দেখা মানুষ), আসিবা দিন (=আগামী দিন)।

৭. বিশিষ্টার্থক ধাতু হিসেবে যৌগিক ক্রিয়াপদে √খা-র প্রয়োগ (খোয়া < খাদ্) লক্ষণীয়। যেমন—আগ খোয়া (= রাগ করা), মনত্ খোয়া (= মনে লাগা), হতাশ খোয়া ইত্যাদি।

অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

নঞর্থ উপসর্গ ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহৃত। যেমন— না জাঁও, না লেখিম্ ইত্যাদি।

১৪.৫ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় শব্দের গোড়ায় 'র'-কারের লোপ ঘটেছে, এমন একটি উদাহরণ দিন।

২. জননী > জলনী—এটি কামরূপী উপভাষার কোন্ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, তা উল্লেখ করুন।

৩. কামরূপী উপভাষায় '-ল' যুক্ত ভাববচন ব্যবহারের একটি উদাহরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. বরেন্দ্রী উপভাষার পাঁচটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে উল্লেখ করুন।

২. কামরূপী উপভাষার পাঁচটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. সংক্ষেপে বরেন্দ্রী উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. বরেন্দ্রী ও কামরূপী উপভাষার পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করুন।

৩. সংক্ষেপে কামরূপী উপভাষার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

একক ১৫ ❑ বাংলা উপভাষার পরিচয় (গ)

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ বঙ্গালী উপভাষা

ক) বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) বঙ্গালী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৫.৪ বিভিন্ন উপভাষার নিদর্শনগত পার্থক্য

১৫.৫ অনুশীলনী

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার বঙ্গালী উপভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে।

১৫.২ প্রস্তাবনা

ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক দিক থেকে বঙ্গালী উপভাষাটি আলোচিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা এই উপভাষাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি জানার পাশাপাশি রাঢ়ী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী এবং কামরূপী উপভাষার থেকে বঙ্গালী উপভাষাটির পার্থক্য করতে সমর্থ হবে। বিভিন্ন উপভাষার নিদর্শনগত পার্থক্য সম্পর্কেও তারা জানতে পারবে।

১৫.৩ বঙ্গালী উপভাষা

(ক) বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. ‘এ’ ধ্বনির ‘অ্যা’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন— তেল > ত্যাল, দেশ > দ্যাশ, দিলেন > দিল্যান।

২. ‘ও’ ধ্বনির ‘উ’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন— কোন > কুন, কোদাল > কুদ্যাল, কোপ > কুপ।

৩. স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা বজায় নেই। যেমন— চাঁদ > চাদ (tsad), পাঁচ > পাচ ইত্যাদি। ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট ইত্যাদি স্থানে এই ধরনের উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষণীয়।

৪. তাড়িতধ্বনি 'ড়' বা 'ঢ়' আসলে 'র' ধ্বনিতে রূপান্তরিত। যেমন— বড় > বর, গাড়ি > গারি, তাড়া > তারা।

৫. শব্দের আদি বা মধ্যস্থ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ ধ্বনি, সঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— ভাই > বাই, ধন > দন, সভার > সবার।

৬. 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' যথাক্রমে 'ৎস', 'স', 'দজ্', 'জ' (ts, s, dz, z) রূপে উচ্চারিত। চাঁদ > ৎসাদ, ছাওয়াল > সাওয়াল, জানা > zana।

৭. আদি 'হ' দুর্বল হওয়ায় তা লুপ্তপ্রায় ও তার ফলে কণ্ঠনালীর স্পর্শধ্বনির উদ্ভব। যেমন— হইব > 'ঐব (oibo), হয় > 'অয়।

৮. শব্দমধ্য 'ট', 'ঠ' ধ্বনি 'ড' ধ্বনিতে পরিণত। যেমন— এটা-সেটা > ইডা-সিডা, মিঠা > মিডা, ছোটোটি > সোটোডি।

৯. অঞ্চলবিশেষে 'স' ও 'শ' ধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— 'সে' > 'হে', সকল > হগল, শুনিয়া > হুইন্যা ইত্যাদি।

(খ) বঙ্গালী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রূপতাত্ত্বিক :

১. কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। যেমন— রামে গিছে, মায়ে ডাকে।

২. কর্মকারকে 'রে' বিভক্তি। আমারে দ্যাও, কারে মারতে যাও?

৩. অধিকরণকারকে 'ত', '-তে' বিভক্তি। যেমন, ঘরের কোয়ালিত্, শহরত্ আই (শহরে আসিয়া), পানিতে ভিজাও ইত্যাদি।

৪. তির্যক কারকের বহুবচনে 'রা', 'গো' অনুসর্গীয় বিভক্তি যোগ। তাগো মৈদদে (তাদের মধ্যে)।

৫. বহুবচন প্রত্যয় 'গুলি'-র বদলে 'গুনাইন', 'গুন'-র প্রয়োগ। কাজগুলি > কাজগুন।

৬. সামান্য বর্তমান দ্বারা ঘটমান বর্তমানের অর্থপ্রকাশ। মায়ে ডাকে (মায়ে ডাকিতেছে)।

৭. সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি '-লাম' যোগ। যেমন—আমি খাইলাম।

৮. রাঢ়ীতে যা ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি, বঙ্গালীতে সেটা পুরাঘটিত বর্তমানের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— আমি করসি (< করছি)। অর্থাৎ, আমি করেছি।

৯. মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল 'বা'। যেমন— তুমি যাবা না?

১০. উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি হল '-উম' ও '-মু'। আমি যামু (আমি যাবো), আমি খেলুম না (আমি খেলব না)।

১১. অতীত কালের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নঞর্থক অব্যয় '-নাই'। যেমন— তুমি যাও নাই? (তুমি যাও নি?)

অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্নকালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে, অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন— শাম গ্যাসে গিয়া (শ্যাম চলে গেছে)।

১৫.৪ বিভিন্ন উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনগত পার্থক্য

১. **রাঢ়ী :** একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে বললে, 'বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে ভাগ আমি পাবো, তা আমাকে দিন।' তাতে তাদের বাপ তার বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

২. **ঝাড়খণ্ডী :** এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মাঝে ছুট্টু বেটা তার বাপকে বল্লেক, 'বাপ্ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্বা আমি পাব তা আমাকে দাও।' এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করে তার হিস্বা তাকে দিলেক।

৩. **বরেন্দ্রী :** য়্যাক্ কোন্ মানুষের দুটা ব্যাটা আছ্লো। তার ঘোর বিচে ছোট্কা আপ্নার বাবাক্ কহ্লে, 'বাব ধন্-করির যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক দে।' তাৎ তাঁই তারঘোরকে মালমাত্তা সব ব্যাঁটা দিলে।

৪. **কামরূপী :** এক জনা মান্সির্ দুই কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্দে ছোটজন উয়ার বাপোক্ কইল, 'বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন।' তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল।

৫. **বঙ্গালী :** য়্যাক্ জনের দুইডী ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, "বাবা, আমার বাগে যে বিত্তি-ব্যাসাদ্ পরে, তা আমারে দ্যাও।" তাতে তিনি তান্ বিষয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান।

১৫.৫ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. একটি উদাহরণ দিয়ে দেখান, বঙ্গালী উপভাষায় 'ও' ধ্বনির কীভাবে 'উ' ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

২. বঙ্গালী উপভাষায় অধিকরণকারকে 'ত্' বিভক্তি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. বঙ্গালী উপভাষার পাঁচটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।

২. বঙ্গালী উপভাষার পাঁচটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. বঙ্গালী উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য স-দৃষ্টান্ত আলোচনা করুন।

৩. বঙ্গালী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

একক ১৬ ❑ সাধু ও চলিত ভাষা

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ প্রস্তাবনা

১৬.৩ সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে?

১৬.৪ সাধু ও চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাস

১৬.৫ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

১৬.৬ সাধু ও চলিত ভাষার নিদর্শন এবং রূপান্তর

১৬.৭ সারাংশ

১৬.৮ অনুশীলনী

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে।

১৬.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাস, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা বলতে আমরা কী বুঝি, সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য এবং সাধু ও চলিত ভাষার কিছু নিদর্শনসহ সাধু থেকে চলিত ও চলিত থেকে সাধু ভাষার রূপান্তর-ই এই এককের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

১৬.৩ সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে?

পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ভাষার মতো বাংলা গদ্যেরও দুটি রূপ—সাহিত্যিক রূপ ও মৌখিক রূপ। বাংলা ভাষার যে-রূপটির আশ্রয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলা গদ্য-গ্রন্থাদি রচিত রচিত হয়েছিল, সেই সাহিত্যিক রূপটির নাম সাধু ভাষা। অন্যদিকে বাংলা ভাষার যে-রূপটি জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে মৌখিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, সেই মৌখিক রূপটির নাম চলিত ভাষা। এই ভাষা মানুষের মুখের ভাষা। সাধু ভাষা হল মার্জিত, সুপরিকল্পিত ও বিন্যস্ত। আর চলিত ভাষা হল অপেক্ষাকৃত অমার্জিত, অপরিকল্পিত ও অবিন্যস্ত।

মূলত বিশুদ্ধ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ, মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপ, বিভক্তি-অনুসর্গ-যোগে

গড়ে-ওঠা সাধু ভাষা ছিল অনেকাংশে কৃত্রিম, বিদগ্ধ, ধীর-গম্ভীর ভাষা— যার ব্যবহার শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে চলিত ভাষা হল জীবন্ত ভাষা। বাংলার মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষার যে-পাঁচটি প্রধান উপভাষা (রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী), সেগুলির মধ্যে রাঢ়ীর কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চল যেমন— হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি স্থানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই সর্ববঙ্গীয় আদর্শ চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali = SCB)।

এই চলিত ভাষার শব্দভাণ্ডারে কিছু বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ আছে বটে; কিন্তু এর মূল সম্পদ হল সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে-আসা বিপুল তদ্ভব শব্দভাণ্ডার এবং এদেশের আর্যপূর্ব জাতিদের ভাষা থেকে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত দেশি শব্দসমূহ। এর শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, বাক্য গঠন মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা থেকে গৃহীত নয়; একালের মুখের জীবন্ত ভাষা থেকে গৃহীত। এই ভাষা এখন যেমন শিক্ষিতজনের মৌখিক ভাববিনিময়ের মার্জিত মাধ্যম; তেমনি এই ভাষা এখন সাহিত্যের ভাষা।

১৬.৪ সাধু ও চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা যখন বাংলায় ধর্মগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে উদ্যোগী হন, তখন তাঁদের সামনে সাহিত্যিক গদ্যের কোনো আদর্শ ছিল না। বাঙালির মুখে গদ্য ভাষার ব্যবহার তাঁরা শুনেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এই মৌখিক ভাষা গুরুগম্ভীর বিষয়ের মাধ্যম হিসেবে হয়তো তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তাই তাঁরা ভাষাকে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর করার জন্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ভাষা থেকে ক্রিয়ারূপ, শব্দরূপ, বিভক্তি, অনুসর্গ ইত্যাদি গ্রহণ করেন এবং মূলত তৎসম শব্দ ও কিছু আরবী, ফারসি, দেশি শব্দ নিয়ে বাংলা সাধু ভাষার মূল কাঠামোটি প্রথম রচনা করেন। এঁদের মধ্যে যাঁর হাতে বাংলা সাধু গদ্যের প্রাথমিক রূপটি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল, তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

ক্রমশ এই সাধু গদ্যের আরো যুক্তিনির্ভর দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ রচনা করেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম তাঁর 'বেদান্ত' গ্রন্থে (১৮১৫) 'সাধুভাষা' শব্দটি ব্যবহার করেন।

মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের গঠিত সাধু গদ্যের কাঠামোতে ছন্দঃস্পন্দন ও শিল্পগুণ সঞ্চারিত করে একে প্রথম আবেগ অনুভূতি প্রকাশের যোগ্য মাধ্যম করে তোলেন বিদ্যাসাগর। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের সূত্রে এই ধারা পুষ্ট হতে থাকে। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এসে বাংলা সাধু গদ্য পূর্ণ বিকশিত রূপ লাভ করে— একাধারে সৃজনধর্মী ও মননধর্মী সাহিত্যের যোগ্য প্রকাশমাধ্যম হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ক্রমে এই ধারায় একটা সরলীকরণের প্রবণতা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং সাধুগদ্য তার আভিজাত্যের সিংহাসন থেকে জনজীবনের ভাষার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। শরৎচন্দ্র তাঁর

উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। শুধু বর্ণনায় ও বিবৃতিতে রেখেছেন সাধু গদ্য। সাধু গদ্যেও শুধু পুরোনো কাঠামোটুকুই বজায় রেখেছেন তিনি; তার শব্দসম্ভারে এনেছেন জীবন্ত ভাষার উপাদান। শরৎচন্দ্রের এই ধারাই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক। এদের মধ্যে বিশেষভাবে বিভূতিভূষণের হাতে বাংলা গদ্য সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশমাধ্যমরূপে চরম বিকাশ লাভ করেছে। তারপর ক্রমে সাধুগদ্যের বাহ্য কাঠামোটুকুও খসে গেছে এবং বাংলা সাহিত্য থেকে সাধু গদ্য বিদায় গ্রহণ করেছে।

সাহিত্যে চলিত গদ্যের ব্যবহার প্রথমে ক্ষীণ ধারায় সূচিত হয় এবং ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করে। উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন'-এ বিভিন্ন শ্রেণির সংলাপে ব্যবহৃত গদ্য যদিও সর্ববঙ্গীয় ব্যবহারের উপযোগী আদর্শ চলিত বাংলা ছিল না; তবু এখানেই মৌখিক গদ্য সাহিত্যে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করে। পরে, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার সংলাপে ইতস্ততভাবে কিছু চলিত গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়।

ইংরেজ শাসনের সময় কলকাতা বাংলার রাজধানী এবং আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের সময়েও শিক্ষা-সাহিত্যচর্চা-সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা প্রাধান্য পায় ও শিক্ষিত ব্যক্তির ভাববিনিময়ের সার্বজনীন মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই কলকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষাকে, কিঞ্চিৎ সাধুভাষার মিশ্রণসহ, সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ আসন দেন প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এ, আর, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় (১৮৬২)।

বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত কথ্য ভাষাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং এই ভাষাকে 'অপর ভাষা' নামে বা, 'প্রচলিত ভাষা' নামে অভিহিত করেছিলেন। হয়তো, এই 'প্রচলিত ভাষা' থেকেই পরবর্তীকালে 'চলিত ভাষা' কথাটির প্রচলন হয়। এরপর থেকেই কলকাতা অঞ্চলের কথ্য বাংলার ওপর ভিত্তি করে আদর্শ চলিত বাংলার সর্বজনীন রূপ গড়ে তোলার এবং সাহিত্যে তার ব্যাপক প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন সূচিত হয়। বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী সংস্কারকও সেক্ষেত্রে আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ও বাস্তববোধের সঙ্গে চলিত ভাষার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলা নাটকের সংলাপে চলিত গদ্যের ব্যবহার হয়েই আসছিল। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত সাধু গদ্যের ব্যবহার করলেও সংলাপে কোথাও কোথাও চলিত গদ্যের ব্যবহার করেছিলেন।

১৯১৪ সালে যখন প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করে চলিত গদ্যের জন্য ব্যাপক সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেন, তখন রবীন্দ্রনাথও তাতে উৎসাহিত হয়ে সাহিত্যে সাধু গদ্যের ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দেন এবং পুরোপুরি চলিত গদ্যে লেখা শুরু করেন। এরপর থেকেই ক্রমে সাহিত্যে চলিত গদ্য একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একদিকে শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় সাধু গদ্য ক্রমশ সরলীকৃত হয়ে মৌখিক গদ্যের

কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। অন্যদিকে চলিত গদ্য আঞ্চলিকতার গণ্ডী পেরিয়ে প্রমথ চৌধুরীর হাতে মার্জিত রূপ ধারণ করেছে। ফলে সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ কমতে থাকে।

১৬.৫ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

১. সাধারণত সাধু ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বেশি। কিন্তু চলিত ভাষায় তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

২. সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা সাধু ভাষায় বেশি। চলিত ভাষায় তা অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

৩. সাধু ভাষায় সর্বনামের পূর্ণ বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'যাহা', 'তাহা', 'যাহার', 'তাহার', 'যাহাদের', 'যাহাদিগের', 'তাহাদিগের', 'ইহা', 'উহা' ইত্যাদি। চলিত ভাষায় সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'তা', 'যা', 'তার', 'যার', 'তাদের', 'যাদের', 'এ', 'ও' ইত্যাদি।

৪. ক্রিয়ারও অনেকক্ষেত্রে সাধু ভাষায় দীর্ঘরূপ প্রচলিত। চলিত ভাষায় প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন, সাধু ভাষায় 'করিয়া', 'করিতেছি', 'করিয়াছি', 'করিয়াছিলাম' চলিত ভাষায় যথাক্রমে 'করে', 'করছি', 'করেছি', 'করেছিলাম' ইত্যাদি।

৫. বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত কতকগুলি অনুসর্গেও সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, সাধু ভাষার অনুসর্গ 'দ্বারা', 'সহিত', 'সমভিব্যাহারে', 'হইতে', 'অভ্যন্তরে' ইত্যাদি। চলিত ভাষার রূপ— 'দিয়ে', 'সঙ্গে', 'থেকে', 'ভেতরে', 'মধ্যে' ইত্যাদি।

৬. যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধু ভাষায় বেশি, চলিত ভাষায় তা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। যেমন, সাধু ভাষা— গমন করা, শয়ন করা, শ্রবণ করা, আহার করা ইত্যাদি। চলিত ভাষায়— যাওয়া, শোয়া, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি।

৭. কথ্য ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন (Proverbs) ও বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ (Idioms) চলিত ভাষায় সহজেই খাপ খেয়ে যায়। সাধু ভাষায় সেগুলির প্রয়োগ বিরল।

৯. সাধু ভাষার বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া— এই বিন্যাসক্রম সাধারণত লঙ্ঘন করা হয় না। চলিত ভাষার বাক্যে পদের বিন্যাসক্রম অতখানি যান্ত্রিক নয়, অনেকখানি নমনীয়।

১৬.৬ সাধু ও চলিত ভাষার নিদর্শন ও রূপান্তর

সাধু থেকে চলিত :

সাধু : 'বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে

দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জালনার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।' (রবীন্দ্রনাথ)

চলিত : বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি বাড়ির ভেতরেও আমরা সব জায়গায় যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করতে পারতাম না। সেজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল থেকে দেখতাম। বাহির বলে একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যা আমার অতীত, অথচ যার রূপ শব্দ গন্ধ দরজা-জানলার নানা ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এদিক-ওদিক থেকে আমাকে চকিতে ছুঁয়ে যেত। সে যেন গরাদের ফাঁক দিয়ে নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করার নানা চেষ্টা করত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ— মিলনের উপায় ছিল না, সেজন্যে প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছে গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নি। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাইরেই।

চলিত থেকে সাধু :

চলিত : 'সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারদিকে পাথর, পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে— দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে-বনে, পর্বতে-প্রান্তরে; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরনীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।'

(রবীন্দ্রনাথ)

সাধু : সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ হইতে নব-জাগরিত পঙ্কস্তরের ভিতরে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠাইয়াছে— সেদিন পশু নাই, পাখি নাই, জীবনের কলরব নাই, চারিদিকে পাথর পঙ্ক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলিয়া বলিয়াছে, 'আমি থাকিব, আমি বাঁচিব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়া অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করিব রৌদ্রে-বাদলে— দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও বনে-বনে, পর্বতে-প্রান্তরে উঠিতেছে; তাহাদেরই শাখায় পত্রে ধরনীর প্রাণ বলিয়া বলিয়া উঠিতেছে, 'আমি থাকিব, আমি থাকিব।'

১৬.৭ সারাংশ

সাধু ভাষা হল মার্জিত, সুপরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত। আর চলিত ভাষা হল অপেক্ষাকৃত অমার্জিত, অপরিকল্পিত ও অবিন্যস্ত। সাধু ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে তৎসম শব্দের আধিক্য। অন্যদিকে মূলত তদ্ভব এবং দেশি শব্দসমূহই চলিত ভাষার প্রাণ। প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের সূত্রে সাধু ভাষায় বাংলা গদ্য পরিপুষ্টি লাভ করে। ক্রমে সাধু-র বদলে চলিত গদ্যই হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম। সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা, সর্বনাম-ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহার, যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার ইত্যাদির নিরিখে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

১৬.৮ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. সাধু ভাষা কাকে বলে?

২. চলিত ভাষা কাকে বলে?

৩. 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়?

৪. চলিত ভাষাকে 'অপর ভাষা' বা 'প্রচলিত ভাষা' নামে কে অভিহিত করেছিলেন?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. সাধু ভাষা বলতে কী বোঝেন, উদাহরণ যোগে বুঝিয়ে দিন।

২. চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাসটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

২. সাধু ও চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাসটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করুন।

একক ১৭,১৮ ❑ বাংলা শব্দভাণ্ডার

গঠন

১. উদ্দেশ্য

২. প্রস্তাবনা

৩. বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত বিভাজন

৪. বিভাজনগুলির সংজ্ঞা ও উদাহরণ

৫. সারাংশ

৬. অনুশীলনী

৭. স্নাতক বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. উদ্দেশ্য

এই একক দু'টি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে জানতে পারবে।

২. প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে কী ধরনের শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেই শব্দগুলিকে কোন্ কোন্ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, প্রত্যেকটি বিভাজনের সংজ্ঞা-সহ উদাহরণের ভিত্তিতেই এই একক দু'টি গঠন করা হয়েছে।

৩. বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত বিভাজন

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত বিচারে মোট তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— (১) মৌলিক বা নিজস্ব, (২) আগন্তুক বা কৃতঋণ এবং (৩) নবগঠিত।

মৌলিক বা নিজস্ব শব্দের তিনটি বিভাজন— তৎসম, অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব। তৎসম শব্দের আবার দু'টি ভাগ— সিদ্ধ তৎসম ও অসিদ্ধ তৎসম। তদ্ভব শব্দকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়— নিজস্ব তদ্ভব এবং কৃতঋণ বা বিদেশি তদ্ভব দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ইত্যাদি।

আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ মূলত দুই প্রকার— দেশি এবং বিদেশি। দেশি শব্দের দুই ভাগ— অনার্য এবং আর্য। বিদেশি শব্দের মধ্যে বিবিধ বিদেশি শব্দ যেমন—ইংরেজী, জার্মান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

নব-গঠিত শব্দেরও দুই ভাগ— অবিমিশ্র এবং মিশ্র বা সংকর। অর্থাৎ—

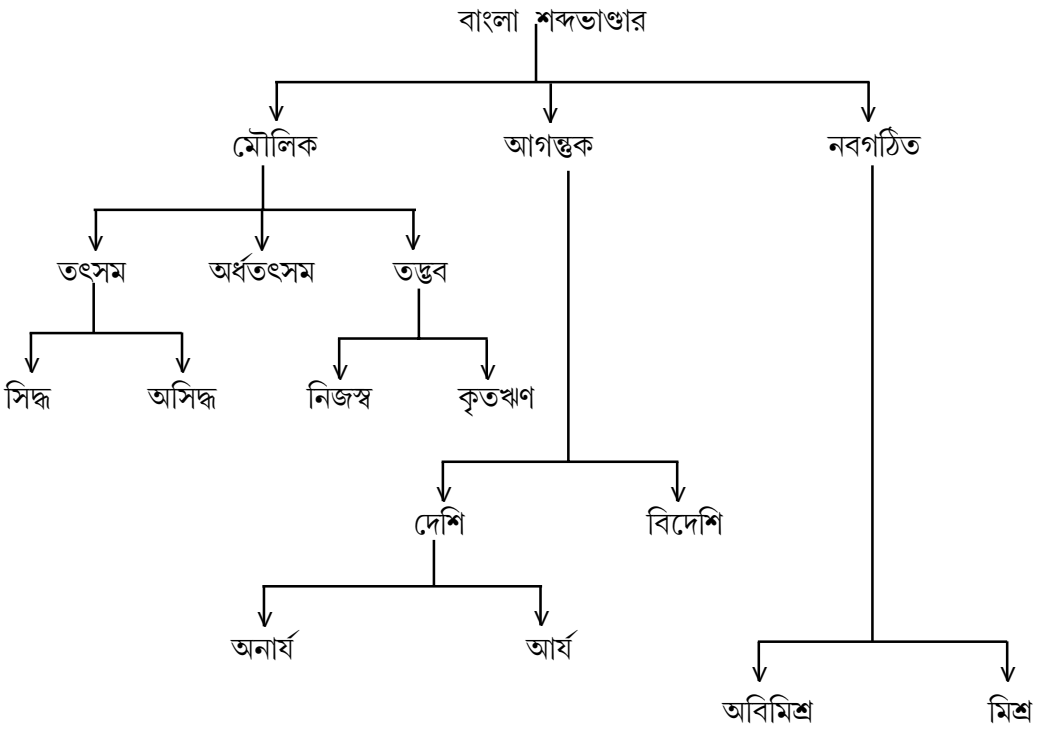

৪. বিভাজনগুলির সংজ্ঞা ও উদাহরণ

১. তৎসম শব্দ : যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, তাদের তৎসম শব্দ বলে। 'তদ্' শব্দের অর্থ হল 'সংস্কৃত'। 'সম' শব্দের অর্থ হল 'সমান'। সুতরাং, 'তৎসম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'সংস্কৃতের সমান'। অর্থাৎ, সংস্কৃত শব্দই অপরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে। মূল সংস্কৃত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপটিই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে শব্দের শেষস্থ বিসর্গ (ঃ) বা ম্ (ং) বর্জিত হয়েছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রায় অর্ধাংশ এই তৎসম শব্দে পুষ্ট।

যেমন—সংস্কৃত, ভাণ্ডার, শব্দ, অবিকৃত, ব্যবহৃত, তৎসম, তদ্ভব, শর, উদাহরণ, পিতা, মাতা, শিক্ষালয়, আচার্য, শিক্ষক, সকল, পদ, গজ, কৃষ্ণ, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দগুলিকে আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সিদ্ধ তৎসম ও অসিদ্ধ তৎসম।

সিদ্ধ তৎসম : যে-সমস্ত শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ সিদ্ধ, সেগুলিই হল সিদ্ধ তৎসম শব্দ। যেমন— সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি।

অসিদ্ধ তৎসম : যে-সমস্ত শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়; অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকেই সুকুমার সেন অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলেছেন। যেমন— কৃষাণ, ঘর, চাল, ডাল ইত্যাদি।

২. অর্ধতৎসম শব্দ : যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের পথ অনুসরণ না করে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হতে চেয়েছে, অথচ তৎসম শব্দের মতো নিজের অকৃত্রিম রূপটি বজায় রাখতে পারেনি, তাদের সেই বিকৃত রূপকেই অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। এই শব্দগুলিকে অনেকসময় ভগ্ন-তৎসম নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

যেমন— কৃষ্ণ > কেষ্ট, তৃষ্ণা > তেষ্টা, বৈষ্ণব > বোষ্টম, উৎসন্ন > উচ্ছন্ন, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন, কীর্তন > কেত্তন, প্রসন্ন > পেসন্ন, প্রদীপ > পিদিম, প্রণাম > পেন্নাম, ভ্রম > ভেরম, বৃহস্পতি > বেস্পতি বা বিস্যুত, চন্দ্র > চন্দোর, মহোৎসব > মোচ্ছব, গৃহিণী > গিন্নী, ত্র্যহস্পর্শ > তেরস্পর্শ, ক্ষুধা > খিদে, রাত্রি > রাত্তির ইত্যাদি।

২. তদ্ভব শব্দ : যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে যাত্রা করে প্রাকৃতের পথে নির্দিষ্ট নিয়মে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে নতুনরূপে বাংলা ভাষায় প্রবেশলাভ করেছে, তাদের তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ বলে।

'তদ্' শব্দের অর্থ হল 'সংস্কৃত' এবং 'ভব' শব্দের অর্থ হল 'উৎপন্ন'। অর্থাৎ 'তদ্ভব' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল 'সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন'।

যেমন—

১.	সংস্কৃত	কৃষ্ণ	>	প্রাকৃত	কন্হ	>	তদ্ভব	কানু / কানাই
২.	,,	কর্ণ	>	,,	কনণ	>	,,	কান
৩.	,,	চন্দ্র	>	,,	চান্দ	>	,,	চাঁদ
৪.	,,	বধূ	>	,,	বহু	>	,,	বউ
৫.	,,	অদ্য	>	,,	অজ্জ	>	,,	আজ
৬.	,,	রাধিকা	>	,,	রাহিআ	>	,,	রাই
৭.	,,	সন্ধ্যা	>	,,	সঞ্ঝা	>	,,	সাঁঝ
৮.	,,	হস্ত	>	,,	হত্থ	>	,,	হাত
৯.	,,	খাদতি	>	,,	খাঅই	>	,,	খায়

১০. ,, প্রবিশতি > ,, পবিসই > ,, পৈশে, পশে

১১. ,, কথয়তি > ,, কহেই > ,, কহে, কয়

১২. ,, শুণোতি > ,, সুণই > ,, শোনে, শুনে

এছাড়া অন্যান্য তদ্ভব শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— অধস্তাৎ > হেঁট, অপর > আর, অপস্মরতি > পাসরে, অবিধবা > এয়ো, অলক্ত > আলতা, অশীতি > আশি, অষ্ট > আট, অষ্টপ্রহরীয় > আটপৌরে, অষ্টাদশ > আঠারো, অষ্টবিংশতি > আটাশ, অর্গলয়তি > আগলায়, অক্ষপাট > আখড়া, আত্মন > আপন, আকর্ষণী > আঁকষি, আদিত্য > আইচ (পদবী), আবিশতি > আসে, আরাত্রিক > আরতি, ইন্দ্রাগার > ইঁদারা, উপাধ্যায় > ওঝা, এতদ্ > এই, একাদশ > এগারো, কঙ্কণ > কাঁকন, কর্কট > কাঁকড়া, চন্দ্রাতপ > চাঁদোয়া, স্নেহবৃত্ত > নেওটা, হরিদ্রা > হলুদ, প্রতিবেশী > পড়শী, সপত্নী > সতিন, মণ্ডপ > মেরাপ, বন্যা > বান, সাগর > সায়র, সামন্তপাল > সাঁওতাল, নবনীত > ননী, দেবদারু > দেওদার, তন্ত্র > তাঁত, গ্রাম > গাঁও, গা, কেতক > কেয়া, গাত্র > গতর।

লক্ষণীয়, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব— উভয় শব্দেরই মূল হল সংস্কৃত এবং উভয়েই মূল সংস্কৃতের রূপটি হারিয়ে ফেলেছে। তবে, তদ্ভব শব্দের মধ্যে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের স্বাক্ষরটি স্পষ্ট। কিন্তু অর্ধতৎসম শব্দের উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে উচ্চারণ বিকৃতিই বড়ো কথা। মূল সংস্কৃত শব্দ 'কৃষ্ণ' ধারাবাহিক রূপান্তরের ফলে 'কানু' ('কানাই') এই তদ্ভব রূপটি পেয়েছে। আর, উচ্চারণ বিকৃতির ফলে অর্ধ-তৎসম 'কেষ্ট' রূপটি পেয়েছে। অবাঙালির মুখে এই 'কেষ্ট' শব্দটি আবার খুব তাড়াতাড়ি 'কিষ্ট' রূপলাভ করেছে। সাধু-চলিত নির্বিশেষে উভয় রীতির ভাষাতেই তদ্ভব শব্দাবলীর বিশেষ সমাদর আছে। কিন্তু সাবেকি আলাপ-পরিচয় এবং চলিত ভাষার রচনা ছাড়া সাধু ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দের বড়ো একটা স্থান নেই।

তদ্ভব শব্দকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—নিজস্ব তদ্ভব ও কৃতঋণ তদ্ভব।

নিজস্ব তদ্ভব : যে-সব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে, সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব শব্দ বলা যায়। যেমন— ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইঁদারা, উপাধ্যায় > উবজ্ঝাঅ > ওঝা ইত্যাদি।

কৃতঋণ তদ্ভব : যে-সব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ (loan word) হিসেবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে, সেই সমস্ত শব্দকে কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশি তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন— ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্য ভাষা থেকে— গ্রিক দ্রাখ্মে (drakhme = মুদ্রা) > সংস্কৃত দ্রম্য > প্রাকৃত দম্ম > বাংলা দাম। আর, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ ছাড়া অন্য ভাষাবংশ থেকে আগত তদ্ভব শব্দের উদাহরণ হল— দ্রাবিড় ভাষাবংশের তামিল পিল্লৈ > সংস্কৃত

পিল্লিক > প্রাকৃত পিল্লিঅ > বাংলা পিলে (ছেলেপিলে), তামিল কাল্ > সংস্কৃত খল্ল > প্রাকৃত খল্ল > বাংলা খাল। অস্ট্রিক ভাষাবংশ থেকে আগত সংস্কৃত ঢক্ক > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলা ঢাকা। মোঙ্গল ভাষাবংশ থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক > প্রাকৃত তরুক্ক > বাংলা তুরুক।

(৪) **আগন্তুক শব্দ :** যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষার পথ অবলম্বন না করে অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেই শব্দগুলোকে আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ বলা যায়। এগুলি অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত-প্রাকৃত হয়ে বাংলায় আসেনি বলে এইগুলি হল কৃতঋণ শব্দ। কৃতঋণ তদ্ভব থেকে এগুলি পৃথক।

এই আগন্তুক শব্দের দুটি প্রকার—দেশি ও বিদেশি।

দেশি শব্দ—যে-সব শব্দ ভারতবর্ষেরই অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেই শব্দগুলোকেই বলা হয় দেশি শব্দ। দেশি শব্দ দুই প্রকার—অনার্য ও আর্য।

বঙ্গদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী কোল, ভিল প্রভৃতি অনার্য জাতির ভাষা থেকে জ্ঞাতমূল বা অজ্ঞাতমূল যে-সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেগুলিকে অনার্য দেশি শব্দ বলে। যেমন—অঢেল, কাঁচুমাচু, কুকুর, খোকা, ঘোড়া, চিংড়ি, ছানা, ঝাঁটা, ঝোল, টাল, ডগমগ, ডবকা, ডাব, ডিঙি, ঢেঁকি, ঢিল, দরমা, থোড়, নাদা, পেট, পাঁঠা, মুড়ি ইত্যাদি।

আর্য জাতি ব্যবহৃত যে-সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেই শব্দগুলিকে আর্য-দেশিয় শব্দ বলে। যেমন— হিন্দি ভাষা থেকে লগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত, ওস্তাদ। ডঃ রামেশ্বর শ'-এর মতে, এই ধরনের শব্দের মধ্যে যেগুলি মূলত আরবি-ফারসি শব্দ, সেগুলো আরবি-ফারসি থেকে এদেশেরই ভাষা হিন্দির মাধ্যমে বাংলায় প্রবিষ্ট হয়েছে বলে সেগুলিকেও দেশি শব্দ রূপে গ্রহণ করা উচিত।

বিদেশি শব্দ : ভারতবর্ষের বাইরের দেশ থেকে অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যেসমস্ত শব্দ স্বরূপে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেই শব্দগুলিকে বিদেশি শব্দ বলে।

এই শব্দগুলির মধ্যে বহির্ভারতীয় ইংরেজী, আরবি, ফারসি, পোর্তুগীজ শব্দই সংখ্যায় বেশি। আর, অন্তর্ভারতীয় প্রতিবেশী শব্দাবলীর মধ্যে হিন্দির আধিক্য লক্ষণীয়।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গদেশ তুর্কী-কবলিত হওয়ার পর থেকেই ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হতে থাকে। আকবরের শাসনকালেই বাংলায় ফারসি শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে, এমনকি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদেও ফারসি শব্দের অজস্র উদাহরণ আছে। ফারসির পাশাপাশি অসংখ্য আরবি শব্দও বাংলায় প্রবিষ্ট হয়। ষোড়শ শতক থেকে ভারতে বাণিজ্যরত পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদেরও বহু শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে। আবার, দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনাধীন থাকার ফলে বহু ইংরেজি শব্দ স্বরূপে বা

ঈষৎ বিকৃতরূপে বাংলার ভাষাভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হয়ে এই ভাষাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। বিদেশি শব্দের উদাহরণ—

আরবি : অছিলা, আকছার, আক্কেল, আদালত, আমানত, আসবাব, আলাদা, আসামী, আস্তাবল, আহাম্মক, ইজারা, ইজ্জত, ইনাম, ইমারত, ইশারা, এজলাস, ওকালতি, ওজন, ওজর, কবজা, কবুল, কলপ, কাজী, কানুন, কাবাব, কামিজ, কায়দা, কালিয়া, খালাসি, খেসারত, গোসল, গায়েব, ছবি, জবাই, জরিপ, জলসা, তছরুপ, তফাত, তামাশা, দায়রা, দেমাক, দোয়াত, দৌলত, ফতোয়া, ফকির, নেশা, ফৌজ, বায়না, বিলকুল, মকদ্দমা, মকুব, মুহুরী, মেরামত, রাজী, রায়, শখ, শরিফ, শর্ত, সফর, সাবেক, হক, হজম, হদিশ, হামলা, হামাম, হিসাব, হেপাজত ইত্যাদি।

ফারসি : আইন, উমেদ, ওস্তাদ, আওয়াজ, আঙুল, আপশোশ, আরাম, আয়না, ইরান, কম, কাগজ, কাবাব, কারখানা, কুস্তি, খানদান, খানসামা, খাম, গালচে, গঞ্জ, গোয়েন্দা, চরকা, চশমখোর, চাপরাশ, চেহারা, জমি, জানোয়ার, জামা, তছনছ, তরকারি, তরমুজ, দরকার, দরবার, দরখাস্ত, নমাজ, নমুনা, নাবালক, পনির, পয়গম্বর, পয়জার, নিমক, নাশপাতি, নালিশ, পালোয়ান, পেয়াদা, পেয়ালা, ফরিয়াদী, ফাঁস, বগল, বকশিস, বদমাস, বরফ, বরবাদ, মালিশ, মাহিনা, মিনার, রাস্তা, রাহাজানি, রিফু, লাশ, লাগাম, শামিয়ানা, শায়েস্তা, শাল, সরকার, সুপারিশ, হেস্তনেস্ত, হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

আরবি-ফারসির মিশ্রণ : আদমশুমার, ওকালতনামা, কুচকাওয়াজ, কোহিনূর, জমাদার, জরিমানা, পোদ্দার, বকলম, বেআক্কেল, বেদখল, হকদার, পিলসুজ, বেকসুর, হুঁকাবরদার।

তুর্কী শব্দ : কলকা, কাঁচি, কামাত, কাবু, কুলি, কোর্মা, খাঁ, চকমকি, তকমা, তোপ, দারোগা, বকশী, বারুদ, বেগম, বোঁচকা, মুচলেকা।

ইংরেজি শব্দ : অক্সিজেন, অফিস, আরদালি (<orderly), আর্ট, আস্তাবল (<stable), এঞ্জিন, কনস্টেবল, কফি, কমা, কাপ্তেন (<captain), কার্নিস, কার্পেট, কেক, কেটলি, কেরোসিন, কোকেন, কোম্পানি, ক্লাব, ক্লাস, গারদ (<guard), গার্জেন (<guardian), গিনি, গ্লাস, চেক, চেন, জাঁদরেল (<general), জেল, টাইম, টেবিল, টেলিফোন, ডাক্তার (<doctor), ডিপো (<depot), তোরঙ্গ (<trunk), থিয়েটার, নম্বর, নোটিশ, পকেট, পার্লামেন্ট, পালিশ, পিয়ন, পুলিশ, ফিট, বাক্স (<box), বুরুশ (<brush), মেহগনি, মোটর, রিহার্সাল, লেবেল, সার্কাস, সিগন্যাল, সেমিকোলন, হাইকোর্ট, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি।

পোর্তুগীজ শব্দ : আতা, আনারস, নোনা (<এনোনা), আলকাতরা, আলমারি, কেদারা, গামলা, গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, তোয়ালে, পিপা, পেয়ারা, পেরেক (<prego), বালতি, মাইরি (<Maria), মাস্তুল (<mastro), সাবান, সেঁকো ইত্যাদি।

জার্মান শব্দ : জার, কিন্ডারগার্টেন।

স্পেনীয় শব্দ : ডেঙ্গি (<dengue)।

ওলন্দাজী শব্দ : রুইতন, হরতন, ইস্কাবন

গ্রিক শব্দ : কেন্দ্র (<kentron), দাম (<drakhme)

রুশ শব্দ : ভদকা, বলশেভিক, স্পুটনিক

জাপানি শব্দ : জুজুৎসু, টাইফুন, রিকশা, হাসনুহানা।

সিংহলী শব্দ : বেরিবেরি

বর্মী শব্দ : লুঙ্গি

হিন্দি শব্দ : আলাল, ইস্তক, উতরাই, ওয়ালা, কচুরি, কাহিনি, কোরা, খাট্টা, চাপকান, চামেলি, চালু, চাহিদা, চিকনাই, ঝাড়ু, ঝাণ্ডা, টহল, ডেরা, অগড়া, তাঁবু, দাঙ্গা, ফালতু, বীমা, বেলচা।

গুজরাটী শব্দ : গরবা, তকলি, হরতাল।

মারাঠী শব্দ : চৌথ, বর্গী।

তামিল শব্দ : চুরুট

তেলেগু শব্দ : প্যান্ডেল।

(৫) নবগঠিত শব্দ : বাংলা শব্দভাণ্ডারে নবগঠিত শব্দের মধ্যে কিছু শব্দ অবিমিশ্র। যেমন— অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি। বাকি শব্দগুলি হল মিশ্র বা সংকর শব্দ।

মিশ্র বা সংকর শব্দ : এক শ্রেণীর শব্দের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর উপসর্গ, প্রত্যয় ইত্যাদি যোগে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের পারস্পরিক সংযোগে যে-সব নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকেই সংকর শব্দ বা hybrid words বলে। যেমন—

ক) **তৎসম শব্দ** + **বাংলা শব্দ** : পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, নির্ভুল, নিশ্চুপ, কাজকর্ম, ভুলবশত, ফুলপুঞ্জ, মায়াকান্না, বজ্রআঁটুনি, শ্বেতপাথর।

খ) **তৎসম শব্দ** + **বিদেশি শব্দ** : হেডপণ্ডিত, বসন্তবাহার, লাটভবন, নৌবহর, ভোগদখল, আইনসম্মত, ভোটদাতা, পর্দাপ্রথা, রাজসরকার, আরামপ্রিয়, কাগজপত্র, যোগসাজশ, দিনগুজরান, পুনর্বহাল।

গ) **বিদেশি** + **বাংলা শব্দ** : হাটবাজার, মাস্টারমশায়, সাজসরঞ্জাম, গাড়িবারান্দা, মার্কামারা।

ঘ) **বিদেশি শব্দ + বিদেশি শব্দ :** উকিল-ব্যারিস্টার, জজসাহেব, খোদমালিক, কাগজ-পেনসিল, দরজা-জানালা, টাইমটেবিল, হেডমাস্টার।

ঙ) **তৎসম শব্দ + বাংলা প্রত্যয় :** একলা, দীপালী, লক্ষ্মীমন্ত, বারমেসে, দেশি, পুরুষালী, রোগা।

চ) **তৎসম শব্দ + বিদেশি প্রত্যয় :** দাতাগিরি, শিক্ষানবিস, প্রমাণসই, ধূপদানি, স্ফূর্তিবাজ।

ছ) **বাংলা শব্দ + তৎসম প্রত্যয় :** আমিত্ব, রানীত্ব, কাঁকরময়।

জ) **বাংলা শব্দ + বিদেশি প্রত্যয় :** ফুলদানি, ঘুষখোর, ঠিকাদার, বামুনগিরি, বাতিদান।

ঝ) **বিদেশি শব্দ + তৎসম প্রত্যয় :** নাবালকত্ব, খ্রিস্টিয়।

ঞ) **বিদেশি শব্দ + বাংলা প্রত্যয় :** শহুরে, শাগরেদি, গোলাপি, খেয়ালি, জরুরি, গোলন্দাজি, মাস্টারি।

ট) **বিদেশি শব্দ + বিদেশি প্রত্যয় :** ডাক্তারখানা, হররোজ, নকলনবিশি, সরাইখানা, সমঝদার, শামাদান, ডেপুটিগিরি।

৫. সারাংশ

বাংলা শব্দভাণ্ডার মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত— মৌলিক, আগন্তুক এবং নবগঠিত। তৎসম, তদ্ভব এবং অর্ধ তৎসম শব্দসমূহকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মৌলিক শব্দভাণ্ডার। আগন্তুক শব্দাবলী দু'ভাগে বিভক্ত— দেশি ও বিদেশি। অবিমিশ্র এবং মিশ্র— এই দুয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে নবগঠিত বাংলা শব্দভাণ্ডার।

৬. অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. তৎসম শব্দ কাকে বলে?

২. দু'টি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ দিন।

৩. আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ কয় প্রকার ও কী কী?

৪. নিম্নলিখিত শব্দগুলির উৎস নির্দেশ করুন। ওঝা, মেরাপ, গাঁও, আর, ইঁদারা

৫. বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রিক শব্দের উদাহরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. টীকা লিখুন : আগন্তুক শব্দ, দেশি শব্দ, কৃতঋণ তদ্ভব

২. উদাহরণসহ মিশ্র শব্দ কাকে বলে বুঝিয়ে দিন।

৩. তদ্ভব শব্দ কাকে বলে? এটি কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. বৃক্ষচিত্রসহ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২. বাংলা সংকর শব্দের বৈচিত্র্যের পরিচয় দিন।

৩. বাংলা তদ্ভব শব্দের বৈচিত্র্য বিষয়ে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

৪. বাংলা শব্দভাণ্ডারের গৃহীত বিদেশি শব্দের উৎসগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭. স্নাতক বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

২. ডঃ রামেশ্বর শ', 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', তৃতীয় সংস্করণ : ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ: ৮ ফাল্গুন, ১৩৯৪।

৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা', প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৯, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৭।

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা', দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৯, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮০।

৫. পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ', সপ্তম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৭, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭১।

৬. সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', প্রথম আনন্দ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৯।

নোটস্

নোটস্

নোটস্